আমার খাতা।

মূল্য ৸৹ বার আনা।

প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৫৫, আপার চিৎপুর রোড্,
কলিকাতা।

আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস্
৫৫, আপার চিৎপুর রোড্,—কলিকাতা
শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
১৩১৯

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত "আমার খাতা" সম্বন্ধে অভিমত।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও কবি ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তক পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"বাল্যজীবন" খানি আমার খুব ভাল লাগিল—তাহা দিব্য সরস মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ এবং তাহার লেখা ঠিক যেন তোমার মন হইতে টাট্‌কা-টাট্‌কি উথলিয়া উঠিয়াছে। সরস্বতীর দেখাদেখি লক্ষ্মীও তোমার প্রতি প্রসন্ন হো'ন—এই আমার আশীর্ব্বাদ।"

বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রথী ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"আমার খাতা" আমার বেশ লাগ্‌ল।

একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে, শেষ না করিয়া থাকা যায় না। ভাষাও সুন্দর।”

বঙ্গের প্রথম সিভিলিয়ান্, বম্বের ভূতপূর্ব্ব জজ ও বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রথিত নামা ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,

তোমার বাল্যকাহিনীর খাতাখানি পেয়ে খুসি হয়েছি। সহজ কথা সহজ ভাষায় বেশ সুপাঠ্য হয়েছে। তোমার এ বইও পাঠকদের হৃদয়গ্রাহী হবে, সন্দেহ নাই।”

মাজু উচ্চ ইংরাজী স্কুলের হেড্পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে ঃ—

“পরম ভক্তিভাজন মাতৃ-দেশীয়া শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নব প্রকাশিত “আমার খাতা” নামক গ্রন্থখানির ভাষা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। এই গ্রন্থে রচয়িত্রীর পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী, লেখিকা মহোদয়ার “বাল্যজীবন” “ভ্রমণ কাহিনী” মুষ্টিযোগ,

পাকপ্রণালী, ধর্ম্মবিষয়ক কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও ভগবদ্-বিষয়ক সুমধুর ও সুললিত সঙ্গীতাবলী বিচিত্র বর্ণপুষ্পরাজি গ্রথিত একটি সুশোভন মাল্যের ন্যায় বীণাপাণির অর্চ্চনায় নিয়োজিত হইয়াছে।

ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। মূল্য বার আনা মাত্র। পুস্তকের উপকরণের তুলনায় মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়াই বিবেচিত হয়।"

গ্রন্থকর্ত্রীর অপর পুস্তক প্রবন্ধ কুসুম—মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র।

এই পুস্তক দুইখানি কলিকাতা, আদিব্রাহ্ম-সমাজ, হিতবাদী কার্য্যালয়, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান, ২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটরি ও ২১ নং ষ্টেশন রোড্—বালিগঞ্জ, কলিকাতা—এই সকল স্থানে পাওয়া যায়।

সূচীপত্র।

পরমারাধ্যতম স্বর্গীয় শ্রীনাথ ঠাকুর—
পিতা ঠাকুর ও স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর শ্রীচরণে
ভক্তি ও প্রণতির সহিত আমার এই খাতা
উৎসর্গীকৃত হইল।

পিতঃ—

তোমার স্নেহের সন্তান সন্ততিগুলিকে রাখিয়া কোন্ স্বর্গে গিয়াছ, জানি না; সেখানে আমার ভক্তি বিগলিত উচ্ছ্বাস-ধারা তোমার চরণ স্পর্শ করে কি না জানি না; কিন্তু তাহা স্বতঃ উচ্ছ্বাসিত হইতেছে। তুমি বাল্যকালে আমাদের কত উপদেশ দিতে ও ধর্ম্মকথা বলিতে, সে সব আমার হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে; এখন যদি কিছু

করিয়া থাকি বা পাইয়া থাকি তাহা তোমার *কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে*। হৃদয়ের গভীর ভক্তির সহিত আমার খাতাখানি তোমার চরণে প্রদান করিলাম আর কাহারও কাছে ইহার কিছুই মূল্য নাই। তোমার স্নেহের দৃষ্টি যেমন আমাদের উপর আছে, সেইরূপ ইহারও উপর পড়িবে। তুমি যে লোকেই থাক তোমার করুণা-পূর্ণ আঁখি দুটি আমাদের প্রতি চাহিয়া আছে, আশীর্ব্বাদ কর, যেন কঠোর কর্ত্তব্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট না হই। ইতি—

তোমার স্নেহের

কন্যা

ভূমিকা।

বই লিখিলেই ভূমিকা লিখিতে হয়, কিন্তু এ আমার খাতা; তথাপি যখন লেখনী ধরিয়াছি, তখন কিছু লিখিতে হইবে এবং কিছু ব্যক্তব্যও আছে। আমার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লেখিকার লেখা জনসমাজে প্রচার করিয়া যশাকাঙ্ক্ষা করি না, করিলেই বা তাহা পাইব কেন? সুতরাং আমি আমার এ খাতাখানিকে স্নেহের আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে চাই।

সাধারণ পাঠকের প্রতি লেখিকার বিনীত নিবেদন এই যে, শত সহস্র বাধা ও বিঘ্ন সত্ত্বেও গৃহ কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আমার এ খাতা লিখিয়াছি ও যে হৃদয় লইয়া এ খাতা লিখিতে আরম্ভ করি অল্পদিনে সে হৃদয় ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। এই সংসারের গতি দেখিয়া শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিলাম।

ইচ্ছা ছিল গৃহিনীপনা একটু বিস্তারিত

করিয়া লিখিব কিন্তু সময়াভাবে তুই কথায় শেষ করিতে হইল, তথাপি কার্য্যকরী মুষ্টিযোগ কয়টির জন্য উহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। হিন্দুস্থানীর মহাভারত বলার ন্যায় আমার গৃহিনীপনা শেষ হইয়াছে। এক হিন্দুস্থানী অপরকে বলিতেছিল—আরে ক্যা মহাভারত মহাভারত বোলতা হ্যায়, এক কুন্তী থা উসকা পাঁচ লড়কা, আউর এক গন্ধারী থা উসকা সও লড়কা। লেকিন থোড়া জমিন্‌কা লিয়ে কাজিয়া হূয়া আউর দাঙ্গা করকে মার দিয়া—মহাভারত তো এহি হ্যায়।

অনেক লেখা হারাইয়া লেখিকার নিজ যোগ্যতা বুঝা উচিত ছিল, তথাপি লেখিকা লেখনী পরিত্যাগ করে নাই, তাহারই ফলে এ খাতা বাহির হইল। কিমধিকমিতি।

আমার পিতৃদেব।

আমার পূজনীয় পিতৃদেব কলিকাতার ঠাকুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শৈশবে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত হন, তাঁহার বাল্য যৌবন ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যেই কাটে, তথাপি তিনি সংস্কৃত ও ইংরাজি বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এক কথায় বলিতে গেলে শিক্ষিত ছিলেন। মধ্য বয়েসে ঘটনাচক্রে তিনি বীত-বিভব হইয়াছিলেন। আমার যখন জ্ঞান হয় তখনও পিতার লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তিনি শেষ জীবনে সব হারাইয়া অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছিলেন, নশ্বর ধন হারাইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি থিয়োজফিষ্ট হন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। তিনি গননা করিয়া যাহাকে যাহা ভবিষ্যৎ বাণী বলিতেন, তাহাই সফল হইত।

আমার পিতা দার্শনিক ছিলেন, বেদান্ত তাঁহার শেষ জীবনের সম্বল হইয়াছিল, তাঁর অনেকগুলি শিষ্যও ছিল। তিনি উপদেশসহাস্রী নামে এক সংস্কৃত পুস্তক অনুবাদ করেন। তাহা তাঁর এক শিষ্যের নামে ছাপা হইয়াছিল। কারণ তিনি যশ আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তিনি সংস্কৃত কাব্য ও অনেক পড়িয়াছিলেন ; রঘু, কুমারসম্ভব, মাঘ, শকুন্তলা ভবভূতি ও ভারবী প্রভৃতি কবির শ্লোক সকল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি যখন আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত কাব্যালোচনা করিতেন তখন আমি কৌতূহলের সহিত সেই সকল শুনিতাম। আমি যা কিছু পাইয়াছি, তাহা পিতার আশীর্ব্বাদ ও উপদেশে। আমার হৃদয়ের তৃপ্তির জন্য তাঁহার অশেষ গুণের কথা দু একটি না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি অটল ধৈর্য্যের সহিত দরিদ্রতাকে হাস্যমুখে বহন করিতেন, তাঁহার শান্ত শ্রী দেখিলে

সকলেরই ভক্তি হইত। তাঁহার কথা লিখিতে বসিয়া সেই ঋষিতুল্য কান্তি যেন দেখিতে পাইতেছি। পিতৃদেবের চরণে সভক্তি প্রণাম করিয়া তাঁহার কথা শেষ করিলাম

পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গঃ
পিতাহিঃ পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে
প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥

আমার মাতৃদেবী।

আমার পূজনীয়া জননী দেবী ঠাকুরবংশের দৌহিত্রীর কন্যা ছিলেন। তিনি শৈশবে পিতামাতাকে হারাইয়াছিলেন। আমার জননীকে ও আমার পূজনীয় মাতুল মহাশয়কে এক আত্মীয়া বিধবা রমণী লালনপালন করিয়াছিলেন, দুই ভাই ভগ্নির বাল্যজীবন তাঁহারই কাছে কাটিয়াছে আমার জননী দেবী সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যে এমন একটি কমনীয়তা ছিল যে তাঁহাকে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। মাতৃদেবীর যখন ৯ বৎসর বয়স্ তখন তাঁহার বিবাহ হয়, তিনি পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। শুনিয়াছি, যখন আমার বিমাতা জীবিত ছিলেন তখন একদিন কোন কর্ম্ম উপলক্ষে তিনি আমার মাকে দেখিয়া পিতাকে বলেন—দেখ, কেমন একটি সুন্দরী মেয়ে এসেছে, ওকে বিয়ে কর্‌বে? তখন

কে জানিত এই রহস্য-বাক্য একদিন সত্যে পরিণত হইবে ? তাহার কিছুদিন পরেই আমার বিমাতা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এক বৎসর কি ততোধিক পরে আমার জননী দেবীর পিতার সহিত পরিণয় হইল। বিবাহের পরদিন যখন সকলে বধু লইতে আসিল ও বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিল তখন সেই বাড়ীতেই আমার জননীর আর এক আত্মীয়া পূজায় উপবিষ্টা ছিলেন। আমার জননী তাঁহার কাছে পলাইয়া গিয়া বলিলেন—কর্ত্তা-মা উহাদের গহনা কাপড় লইয়া যাইতে বল ; আমি উহাদের বাড়ী যাইব না। এই কথায় আমার জননীর লোভশূন্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই ৯ বৎসরের বালিকাকে পতিগৃহে আসিয়া শাশুড়ীর অভাবে অনেক লাঞ্ছনা ও কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। বড়লোকের বধূ হইয়াও ভোগবিলাসের পরিবর্ত্তে দারিদ্র্যের কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাঁহার

বাল্যজীবন দুঃখেই কাটিয়া ছিল। মধ্যজীবনে সুখ ভোগ আরম্ভ হইতে না হইতেই দারিদ্র্য ঘনাইয়া আসিয়া সে সুখটুকু হরণ করিয়া লইল; তথাপি সেই চিরপ্রফুল্ল মুখখানিতে কখনও বিষাদের ছায়া পড়ে নাই। আমার জননীর কোন্ গুণের কথা রাখিয়া কোন্ গুণের কথা বলিব। পতিভক্তি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সমস্ত গৃহকর্ম্মে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। রুগ্ন ও দুর্ব্বল শরীরে সমস্ত সংসারের কর্ত্তব্য একাকী স্বহস্তে সুন্দররূপে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পন্ন করিতেন। রন্ধন-কার্য্য এত ভাল জানিতেন যে রোগীর পথ্য ও তাঁহার হস্তে অতি সুস্বাদু হইত। তিনি কখন বৃথা আমোদে সময় নষ্ট করিতেন না। যেটুকু সময় পাইতেন রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিতেন। অমিতব্যয়ীও ছিলেন না কৃপণও ছিলেন না। স্ত্রীলোকের যে সকল গুণ থাকা উচিত সেই সকল গুণে তিনি ভূষিতা

ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে তাঁহার জীবনের গুণাবলী লোকসমাজে প্রচার করিয়া জীবন সার্থক করিলাম।

আমার খাতা।

আমার বাল্যজীবন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অতি শৈশবে সামান্যমাত্র বুদ্ধির বিকাশ যখন হইয়াছে, তখন আমি আমার পিতার এঁড়েদহ কামারহাটিস্থ গঙ্গার ধারের বৃহৎ বাগানে বাস করিতাম, সুতরাং ঐ স্থান আমার শৈশবের লীলাভূমি ছিল। সেখানকার প্রত্যেক গাছপালার সহিত আমার শৈশবস্মৃতি জড়িত আছে। আমার সেই বাল্যকালের স্মৃতি এখনও আমার মনকে ব্যথিত ও আনন্দিত করে। আমার বাল্যকালের যে স্মৃতি হৃদয়ে আবদ্ধ রহিয়াছে, সেটুকু আমার সঙ্গেসঙ্গেই চলিয়া

যাইবে। সেইজন্য বাল্যকালের কথা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবার ইচ্ছা মনে অনেক দিন হইতে হইয়াছিল। এত দিনে তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। আমি শৈশবে দুর্ব্বল, ভীত ও কৃশ ছিলাম এবং কঠিনকঠিন রোগ ভোগ করিয়া স্নায়বিক দুর্ব্বলতাও জন্মিয়াছিল, কিন্তু আমি বড় চিন্তাশীলা ছিলাম, আমার পাঁচ বৎসর বয়সের কথা বেশ মনে আছে। আমি গাছের ফুল দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিতাম, সুন্দর ফুল চিত্রবিচিত্র প্রজাপতি ও ছোট ছোট পাখীদের বড় ভালবাসিতাম। শৈশবে ইহারাই আমার সঙ্গী ছিল; আমি প্রত্যহ বৈকালে দাসীর সহিত বাগানে বেড়াইতে যাইতাম ও সযত্নে কুসুম চয়ন করিয়া গঙ্গার ধারে সোপানের উপর বসিয়া কি যে আনন্দলাভ করিতাম তাহা আর কি বলিব। ঊৰ্দ্ধে দিগন্তবিস্তৃত আকাশ, নিম্নে ফলফুলসুশোভিত উদ্যান, সম্মুখে ধীরপ্রবাহিনী গঙ্গা; আমি এই

সৌন্দর্য্যের মধ্যে আত্মহারা হইয়া বসিয়া থাকিতাম। পরে একটি একটি করিয়া ফুল গঙ্গাবক্ষে ফেলিতাম। ফুলগুলি নাচিতে নাচিতে যাইত, ভাবিতাম, ফুল কোথায় যাইতেছে, আকাশের দিকে চাহিয়া কি একটা ভাবে মোহিত হইতাম। আমার রাশীকৃত খেলনা ছিল। মেয়েরা রাঁধাবাড়া ও বৌ-বৌ খেলে, আমি কখনও সে খেলা করি নাই, পাড়ার মেয়েরা যদি কখনও আমাকে খেলিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিত, আমি একেবারে লজ্জায় মৃত-প্রায় হইতাম, তাহারা এক হাত ঘোমটা দিয়া গৃহিণীর ভান করিয়া খেলিত। তখন আমি আস্তে আস্তে সেখান হইতে সরিয়া যাইতাম, পাড়ার মেয়েরা আমায় বড় ভালবাসিত, তাহার মধ্যে ঘোষালদের একটি মেয়ের সহিত আমার বড় ভাব ছিল। মেয়েটি সুন্দরী ও রোগা ছিল। সে প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের সময় আমাদের বাড়ী আসিত। একদিন সে অন্য

মেয়েদের সঙ্গে খেলায় যোগ না দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, ভাই, তোমার কি খেলা ভাললাগে? আমি ত কিছুক্ষণ ভেবে কিছুই ঠিক্ করিতে পারিলাম না। তথাপি তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বলিলাম আমার ফুল-খেলা ভাললাগে। এস ভাই আমার খেলনাগুলিকে ফুল দিয়া সাজাই। তখন সে ফুল তুলিয়া আনিল ও তাহাতে আমাতে পুতুলগুলিকে ফুল দিয়া সাজাইলাম। সেই দিন হইতে সে আমায় ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া দিত। সে যতক্ষণ আমার কাছে থাকিত এই তার খেলা ছিল। পরে বাড়ী গিয়া সে তাহার একখানি ছোট ঘরে হাঁড়িকুঁড়ি লইয়া রাঁধাবাড়া খেলা করিত। একদিন তাহার বাড়ী গিয়া দেখি, সে বিবস্ত্রা হইয়া খেলা করি-তেছে দেখিয়া বলিলাম, ছি ভাই, কাপড় না পরিয়া কেন খেলা করিতেছ? এই কথা বলিয়াই আমার মনে এত কষ্ট হইয়া ছিল যে

শত-চেষ্টাতেও তাহার সহিত কথা কহিতে পারি নাই। পরে বাড়ী আসিয়াও বারবার সেই কথা মনে হইয়াছে। পরদিন সে আমাদের বাড়ী আসিলে তাহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া তবে আমার মন স্থির হয়, আমার একটু সামান্য দোষ হইলে মন এত খারাপ হইত যে, সারাদিন তাহার জন্য মনের বিষণ্ণতা দূর হইত না। যদি কাহারও দুঃখের কথা শুনিতাম বা দেখিতাম, তাহা হইলে নির্জ্জনে বসিয়া ভয়ে ভয়ে কাঁদিতাম, পাছে কেহ দেখিতে পায়। আমার এই ভাব দেখিয়া মা বলিতেন, আমার এ মেয়ে বোধহয় পাগল হইবে। আমার ভাই বা বোন কেহ কোন দোষ করিলে তাহা আমার উপর আসিয়া পড়িত, কারণ আমি কোন কথার প্রতিবাদ করিতাম না, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কান্না ছাড়া আর আমার কিছুই সম্বল ছিল না। সেই জন্য আমার নাম ছিঁছকাঁদুনে হইয়াছিল,

সুতরাং মা মনে করিতেন যে যত কিছু অকার্য্য আমার দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

দাদা চঞ্চলপ্রকৃতি ছিলেন। প্রায়ই মার সংসারের আবশ্যক সকল দ্রব্য লোকসান করিয়া ফেলিতেন, আর তিরস্কার ও প্রহার আমার উপর দিয়াই যাইত,—দাদার অসাবধানতার ফল আমাকেই ভোগ করিতে হইত। আমি মনকে প্রবোধ দিতাম যে, আমি ত অপরাধ করি নাই, ঈশ্বর জানেন, দাদার কথা মা জানিলে দাদাকেই ত মা তিরস্কার ও প্রহার করিতেন, এই আমার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল, যখনকার কথা বলিতেছি, তখন আমার বয়স আন্দাজ ৬ কি ৭ বৎসর তখন আমি বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ শেষ করিয়া দ্বিতীয় ভাগ পড়িতাম।

একদিনের ঘটনা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার মা সুগৃহিণী ছিলেন। তিনি একটা বাক্সো করিয়া ভাণ্ডার হইতে কিছুকিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপরে আনিয়া রাখিতেন। একদিন শীতকালে সকালে

সেই বাক্সোর উপর দাদা উঠিয়াছিলেন, যেমন তাহা হইতে অবতরণ করিতে যাইবেন অমনি ইটের উপর বসান বাক্সো ইট হইতে সরিয়া যায় ও তন্মধ্যস্থ নারিকেল তৈল পড়িয়া যায়। দাদা সেখান হইতে আসিয়া আমার কাছে বলিলেন, আয় না, আমরা একটা খেলা করি, দাদা আমাকে খেলিতে ডাকিলেই ভয়ে আমার হৃৎকম্প হইত; কারণ দাদার দৌড়াদৌড়ি ভিন্ন অন্য খেলা ছিল না। আমি ভয়ে ভয়ে দাদার অনুসরণ করিলাম। দাদা ঘরের ভিতর যাইয়া খাটের উপর উঠিয়া একখানি জামেয়ার লইয়া তাঁহার ও আমার গায়ে জড়াইয়া দিয়া আমার কনিষ্ঠা ভগিনী সুষমাকে বলিলেন, তুই আমাদের ছুঁতে আয়, আমরা পালাই, সুষমা যেমন আমাদের ছুঁতে এল, অমনি দুএক পা সরিতে না সরিতেই আমরা জামেয়ার জড়াইয়া পড়িয়া গেলাম ও আমার কপালের কিয়দংশ ফুলিয়া উঠিল। দাদা আমার হাত

ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, হাস, হাস; হাসি কি ছাই আসে। তখন চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতেছে, অনেক কষ্টে চোখের জল মুছিয়া স্থির হইয়া বসিলাম ও বলিলাম, আমার কপাল যে ফুলেছে। মা জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব, তখন দাদা বলিলেন, বলিস্ বাক্সোর উপর উঠিয়া খেলিতে গিয়া পড়িয়া গিয়াছি ও তেলও পড়িয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, মিথ্যা কথা কি করিয়া বলিব? তাহাতে দাদা বলিলেন তোর সত্য কথার জন্য আমি কি মার খাব, আমি অন্য উপায় না দেখিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গাড়ীবারান্দায় গিয়া বসিলাম।

শীতকালের কুহেলিকাচ্ছন্ন আকাশ—গঙ্গার পরপার দেখা যাইতেছে না। গঙ্গাবক্ষে দু একখানি নৌকা রহিয়াছে, নিশির শিশিরসিক্ত ফুল গুলি ফুটিয়া রহিয়াছে, কামিনী ফুলের গাছের উপর একটি মাছরাঙা পাখী বসিয়া-

ছিল; আমি প্রকৃতির শোভা দেখিতেছিলাম; পাখী উড়িয়া গেল, আমার মনে আবার চিন্তা আসিল, কি করিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিব। তাই একমনে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম, দয়াময়, তোমার দয়ার পরিচয় আমায় দেও, এমন সময় মা আসিলেন, আসিয়া আমার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আমাকে কাছে ডাকিলেন ও আমার কপালের ফুলো দেখিয়া আমায় বলিলেন, কি হয়েছে মা, মাথা কি কবিয়া ফুলিয়াছে? আমি কেবল ছুটি কথা বলিলাম, যে আমি পড়ে গিয়েছি ও তেল পড়ে গেছে। তখন মা বলিলেন তেল পড়িয়া গিয়াছে গিয়াছে, আর কোথাও তো লাগে নাই? দাদা তখন পড়িতে গিয়াছেন। সকাল বেলায় দাদার তখন মাষ্টার আসিত, আমি ঈশ্বরের দয়া তখন প্রত্যক্ষ করিয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করিলাম। সকালে দাদা মাষ্টারের কাছে পড়িতেন, বিকেলে আমরা উভয়ে পণ্ডিত

মহাশয়ের কাছে পড়িতাম। কোন কোন দিন পিতা আমাদের পরীক্ষা করিতেন, আমাকে আগে জিজ্ঞাসা করিয়া পরে দাদাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, অবশ্য দাদা আমার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতেন। তথাপি দাদা যেটা বলিতে পারিতেন না, আমি সেটা বলিতাম। এই রকম করিয়া দু একবার বলিলে পিতা আমাকে দাদার কান মলিয়া দিতে বলিতেন, আমি ভয়ে ভয়ে দাদার কানের কাছে হাত নিয়ে গেলে দাদা আস্তে আস্তে বলিতেন, দেখ, আমার কান মলে দিলে উপরে গিয়ে তোকে সাজা দেব, দেখ্‌বি তখন।

একদিন আমরা দুইজনে দুইখানা চেয়ারে বসিয়া আছি। সম্মুখে আর একখানি চৌকিতে পণ্ডিতমহাশয় বেত্রহস্তে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পিতা আসিয়া বলিলেন যে, আজ যে নড়্‌বে তাহাকে বেত মারবেন, বলিয়া চলিয়া গেলেন। বাগানে ভয়ানক মশা, আমার পায়ে

একঠি মশা বসায় আমি যেমন পা নাড়িয়াছি, আর অমনি পণ্ডিত মহাশয় বেত্র আস্ফালন করিয়া আমাকে যেমন ভয় দেখাইতে যাইবেন, আর সেই বেত সজোরে আসিয়া আমার পায়ে লাগিল ও পা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। আর আমি অমনি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। পণ্ডিতমহাশয় অনেক করিয়া আমাকে পড়িতে বলিলেন, কিন্তু আমি কোন মতে মুখের হাত খুলিলাম না, তখন বাবা মহাশয় আসিয়া আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, যে বেত দিয়ে ভয় দেখাইতে গিয়া পায়ে লাগিয়া গেছে। বাবা মহাশয় আমাকে কাছে ডাকিয়া যখন দেখিলেন, যে আমার পায়ে রক্ত পড়িতেছে, তখন আমায় যে মানুষ করিতেছিল সেই দাসীকে ডাকিয়া আমাকে লইয়া যাইতে বলিলেন। দাসী আমাকে বড় ভালবাসিত, সে আমার পায়ে

রক্ত দেখিয়া পণ্ডিতমহাশয়কে গালি দিতে দিতে আমার পায়ে তেলজল দিয়া দিতে লাগিল। আমাদের একজন সরকার ছিল, সে পণ্ডিতমহাশয়ের তিন চারি গাছি বেত জলে ফেলিয়াদিয়াছিল। বাবা মহাশয় এই কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে নিষেধ করিয়া দেন। আমাদের বাড়ীর পরিবারের মধ্যে পিতামাতা ও পিতার এক খুল্লতাত-পত্নী ও তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতা ছিলেন। দিদিমা আমাদের এক প্রকার খেলার সঙ্গী ছিলেন। আমরা পড়িয়া আসার পর হইতে রাত্রি ৯টার পর পর্য্যন্ত খেলা ও গল্প করিয়া আমাদের জাগাইয়া রাখিতেন। সে খেলায় একটুকু নূতনত্ব ছিল। কোন দিন আমি ও দাদা বাগানের গাছ হইতাম, দিদিমা গোড়া খুঁড়িতেন, জল দিতেন, ফুল তুলিতেন, মালা গাঁথিতেন,—সমস্ত কল্পনায়। কোনকোন দিন রামায়ণ ও মহাভারত গল্পচ্ছলে বলিতেন। এ ছাড়া আমাদের নূতন একটি খেলা ছিল।

তাহা জ্যোৎস্নাময়ী রজনী না হইলে হইত না। সে খেলা জগন্নাথক্ষেত্রে যাওয়া,—সেইটাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আমাদের বারান্দায় একখানি জগন্নাথের পট টাঙ্গান ছিল। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে বারান্দায় একখানি মাদুর পাতিয়া দিদিমা বসিতেন, আর আমরা দুই ভাইবোন তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া কৃত্রিম নিদ্রায় নিদ্রিত হইতাম। আর দিদিমা মুখে মুখে জগন্নাথক্ষেত্রে যাইবার আয়োজন করিতেন আর বলিতেন যে ইহারা নিদ্রিত হইয়াছে। ইহাদের রাখিয়া আমি যাইব আর আমরা অমনি জাগ্রত হইয়া বলিতাম যে আমরাও জগন্নাথক্ষেত্রে যাইব। আমরা যখন কিছুতেই থাকিতে চাহিতাম না। তখন দিদিমা বলিতেন অত দূরে হাঁটাপথ, একান্ত না থাক চল, এই বলিয়া সেই গাড়িবারান্দার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দিদিমা বারবার

আস্তে আস্তে যাওয়া-আসা করিতেন আর মুখে গান করিতেন।

"আঠার নালায় পড়ে যাত্রী,
তারে পার করহে শ্রীহরি,
সারারাত্র হেঁটে মলুম,
পোয়া বাট বই কয় না,
জয় জগন্নাথ দয়া কর
আর তো দুখ সয় না।"

তার পর জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়া বাসা লওয়া, জগন্নাথ দর্শন ইত্যাদি সব কল্পনায় চলিত। আর সেই জ্যোৎস্না বারান্দায় আসিয়া পড়িত, সেইটে আমাদের সমুদ্র হইত। কত আনন্দে আমরা সেই সমুদ্রে স্নান করিতাম, ঝিনুক কুড়াইতাম ও প্রসাদ ভোজন করিয়া গৃহে ফিরিতাম। এই আমাদের নিশীথের খেলা। তখন হইতে আমি আমার মার গৃহকর্ম্মে অল্প অল্প সাহায্য করিতাম। মার মাসকাবারের জিনিষপত্র আসিত বেলা দ্বিপ্রহরে। মা যখন

সেই সব দ্রব্য গুছাইয়া যথাস্থানে রাখিতেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে সাহায্য করিতাম। আমার কাছে সামান্য কাগজও বাদ যাইত না, তাহা কুড়াইয়া লইয়া তাহাতে কি লেখা আছে দেখিতাম। তাহার মধ্য হইতে কত গল্প, হেঁয়ালী, গান পাইয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটি এইখানে উদ্ধৃত করিলাম। এক রাজার দুই রাণী ছিল, দুই রাণী থাকিলে যাহা হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। এক দুয়ো ও অপরটি সুয়ো; দুয়ো রাণী যে বড় রাণী, সেটা অবশ্য বলিয়া দিতে হইবে না। একদিন গোয়ালিনী রাজার বাড়ী দুগ্ধ দিতে আসিয়াছে, বড় রাণীকে বিষন্ন বদনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল। হ্যাঁ রাণী মা, অমন মুখখানি ভার করিয়া কেন বসিয়া আছ? তখন রাণী বলিলেন, রাজা আমায় দেখিতে পারেন না, আমার যে কষ্ট, তাহা আর তোকে কি বলিব। গোয়ালিনী বলিল, ও মা আমায় এতদিন তা

বলতে হয়। কেন তোকে বল্লে কি হত ?—কেন ? আমার কাছে এমন এক কবিরাজ আছে যে, তাহার ঔষধে আমার হারান গরু আমি ফিরিয়া পাইয়াছি। রাণী বলিলেন সে কি রকম? গোয়া-নিনী বলিল, আমার ধবলি গরু হারিয়েছিল, সেই যেটার দুধ তোমাদের দিই, তা আমি বসে বসে কাঁদছিলাম, কবিরাজ আমাকে দেখিয়া বলিল, তোমার কি হয়েছে, বাছা, কাঁদছ কেন, তখন আমি বলিলাম, আমার গরু হারাইয়াছে, তাহাতে সে কবিরাজ আমাকে কতকগুলি হরিতকী পড়িয়া দিয়া গেল ও তাহা বাটিয়া খাইতে বলিল, আমি তাহা বাটিয়া খাইতে আমার পেট ছাড়িয়া দিল ও আমাকে বারবার বনের মধ্যে যাইতে হইল। সেখানে গিয়া দেখি আমার ধবলি ঘাস খাইতেছে, আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ ঘরে লইয়া আসি। আমি এখন গিয়া সেই কবি-রাজকে তোমার কথা বলিব, রাণী বলিলেন, বলিস, তাহার পরদিন গোয়ালিনী রাণীর জন্য

হরিতকীপড়া আনিল, রাণী তাহা খাইলেন; রাণীর ভেদ হইতে লাগিল, রাজার নিকট খবর গেল। বড় রাণীর আসন্নকাল উপস্থিত। রাজা কবিরাজ লইয়া আসিলেন ও মনে করিতে লাগিলেন যে, আমারই অযতনে বুঝি রাণী মরিতে বসিয়াছেন। এই অনুতাপ রাজাকে বারবার বিদ্ধ করিতে লাগিল। তদবধি রাজা রাণীকে ভালবাসিতে লাগিলেন। রাণীও সুস্থ হইলেন। এমন সময় রাজার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। নদীর পরপারে বিপক্ষের সেনা আসিয়া শিবির স্থাপন করিল, রাজা ম্লানমুখে রাণীর কাছে আসিলেন; রাণী তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; রাজা বলিলেন, আমার যুদ্ধ উপস্থিত, বিপক্ষের সেনা অনেক, তাহাতে আমাদের যুদ্ধে জয়লাভ করা কঠিন। তখন রাণী বলিলেন, তাহার জন্য চিন্তা কি? আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। বলিয়া সেই গোয়ালিনীকে খবর দিলেন। গোয়ালিনী আসিয়া

কবিরাজের নিকট হইতে পূর্ব্বের মত হরিতকী-পড়া আনিয়া দিল। রাজার প্রত্যেক সৈন্যকে তাহা বাটিয়া খাওয়াইতে বলিল এবং নদীর ধারে মলত্যাগ করিতে বলিয়া দিল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত সৈন্য নদীর ধারে মলত্যাগ করায় অপর পক্ষ ভাবিল, যে-রাজার এত সৈন্য, ইহার সহিত আমরা যুদ্ধে পারিব না। তাহারা বিনাযুদ্ধে পলায়ন করিল। হরিতকীর এই গুণের জন্য কবিরাজ মহাশয় রাজার নিকট হইতে প্রভূত পারিতোষিক পাইলেন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ”

একদিন সকাল বেলায় বাবা মহাশয় দিদিমা ও মা তিন জনে বসিয়া কি কথোপকথন করিতেছিলেন, তার মধ্যে “যাদৃশী ভাবনা” এই কথাটি ছিল, এই কথা শুনিয়া আমি সেথান

হইতে চলিয়া আসিয়া আমার দাদাকে বলিলাম যে, বাবা মহাশয় বলিতেছেন যা ভাবা যায় তাই সিদ্ধ হয় এস আমরা পরীক্ষা করি তাই কিছুক্ষণ পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, একজন সাহেব ও মেম তাহাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে পথ ভুলে আমাদের বাগানে আসে এই বলিয়া আমরা দুজনে এক মনে ভাবিতে লাগিলাম, ঘড়ি দেখিলাম তখন বেলা ৮ টা। ৮টা হইতে সেই গাড়িবারান্দায় বসিয়া ভাবিতে সুরু করিলাম কেবল আহারের সময় উঠিয়া গিয়া ভাবিতে ভাবিতেই আহার করিয়া আসিয়া পুনরায় সেইখানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, যখন বেলা ২টা তখন আমাদের ভাবনা সত্যে পরিণত হইল। কোন্নগরে পাটের কলে যাইবার পথ ভুলিয়া ঐ সাহেব মেম ছেলেমেয়ে লইয়া আসিয়াছিল। তাহারা আমাদের বাগানে প্রবেশ করিবামাত্র প্রথমেই আমাদের চোখে পড়িল। আমাদের চিন্তার সফলতা দেখিয়া

আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল। আমি তাড়াতাড়ি বাবা মহাশয়ের নিকট যাইয়া বলিলাম যে আমরা বাগানে সাহেব মেম আনাইয়াছি, আপনি যাইয়া দেখুন। বাবা মহাশয় বলিলেন, সাহেব মেম আনাইয়াছিস কি রকম? তখন আমি বাবা মহাশয়কে আমাদের ভাবনার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ বলিলাম। বাবা মহাশয় এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া নীচে নামিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় মালী আসিয়া সাহেবের আগমন-সংবাদ দিল। বাবা মহাশয় নীচে যাইয়া সাহেবের সহিত দেখা করিয়া তাহাদের আসিবার কারণ অবগত হইলেন এবং আমাদের মালিকে সঙ্গে দিয়া তাহাদের গন্তব্য স্থানে পাঠাইয়া দিলেন।

আমাদের কোন আত্মীয়ার কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে আমাদের কলিকাতায় আসিবার কথা হয়। তাহাতে আমার বড় আনন্দ হইয়া-

ছিল। মা যখন যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন আমরা তখন আমাদের খেলনাগুলি এখানে ওখানে লুকাইয়া রাখিতেছিলাম। পরে গাড়ী আসিলে আমরা সকলে গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীতে উঠিয়াই আমার মনে কষ্ট হইতেছিল যে আমরা কত ভারী, ঘোড়ার কত কষ্ট হইতেছে, এই ভাবিতে ভাবিতে আমি সারাপথ বিষণ্ণ ও আড়ষ্ট হইয়া গাড়ীতে বসিয়াছিলাম। আমার এই প্রথম কোথাও যাওয়া বা গাড়ী-চড়া। আমরা বেলা ২॥০ টার সময় বাগান হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৭টার সময় কলিকাতায় আত্মীয়ার বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

পল্লীগ্রামের সেই শান্তভাব আর সহরের জনাকীর্ণতা ও কোলাহল দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলাম। রাত্রি হইয়াছিল, আমরা আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম, পথে গাড়ীর ঘড়ঘড়ানির শব্দে বড়ই অশান্তি বোধ হইতে লাগিল পথশ্রমে আমারা ক্লান্ত

হইয়াছিলাম, অল্পক্ষণ পরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম পরদিন সকাল বেলায় উঠিয়া কলিকাতা আর এঁড়িয়াদহর তুলনা করিতে লাগিলাম। বিহঙ্গমের সুমধুর স্বরলহরীর পরিবর্ত্তে কাকের কা কা শব্দে ও গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দে এমন খারাপ বোধ হইতে লাগিল যে, আবার পল্লীর সেই শান্তিময় ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতেছিল। চারিদিকে কেবল বাড়ী, কোথাও একটি নয়নতৃপ্তিকর গাছ দেখিবার যো নাই। তারপর কয়দিন বিবাহের গোলমালে আমার আর অন্য চিন্তার অবসর ছিলনা। বিবাহ হইয়া গেল, আমাদের আত্মীয়গণ পশ্চিমে চলিয়া গেলেন, আমরা সেই বাড়ীতেই রহিলাম। তার পর আমাদের বাগানে ফিরিবার আর কোন আয়োজন না দেখিয়া ভয়ে ভয়ে মার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা কবে যাইব, তখন মা আমাকে কোলে করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে আমাকে বলিলেন, যে আর

আমরা সেখানে যাইব না। মার কথা শুনিয়া আমিও মার কোলে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। মাও অশ্রুমোচন করিতেছিলেন, কাজেই আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারেন নাই।

খানিক পরে হৃদয়ের ভার লঘু হইলে চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন যাওয়া হইবে না। তখন তিনি বলিলেন যে, আমার পিতার সহিত কাকা মহাশয়ের মকর্দ্দমা হইতেছিল, তিনি তাঁহার প্রাপ্য অংশ বাগানটীকে বিক্রয় করিয়া লইবেন। কাজেই আর আমাদের যাওয়া হইবে না।

সেদিনটা আমার ভয়ানক কষ্টে কাটিল। বারবারই মনে হইতে লাগিল যে আসিবার সময় যদি জানিতাম যে এই আমাদের শেষ যাওয়া তাহা হইলে সেখানকার সকলের কাছে বিদায় লইয়া আসিতাম। সেখানকার ফুল ফলের গাছ, গঙ্গা ও বাড়ী আমার হৃদয়কে সহস্র স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল—তীব্র যন্ত্রণা

দিয়া একে একে সেই সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। ভাবিলাম, শৈশবের সুখের স্বপ্নে মগ্ন ছিলাম তাহা ত ভাঙ্গিয়া গেল।

আগে নিজের জীবনকে যেমন করিয়া নিয়োজিত করিয়াছিলাম, জীবননদী যে দিকে প্রবাহিত হইতেছিল তাহা অন্য দিকে প্রবাহিত হইল। তখন হইতে আমার হৃদয়ে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের ভাব ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। ঐ সময় হইতে আমার কর্ম্মের জীবন আরব্ধ হইল।

আমাদের আগে অনেক দাসদাসী ছিল, এখানে আসিবার পর তাহাদের সকলকে ছাড়াইয়া দিয়া কেবল একজন ব্রাহ্মণ, একটি দাসী ও একজন চাকর রাখা হইল। একজন চাকর অনেক দিনের পুরাতন ছিল সে বিনা বেতনে আমাদের বাড়ীতে রহিল তাহাকে আমরা দাদা-ভাই বলিতাম। বাবা মহাশয়ের সেবার জন্য যে সব লোক ছিল তাহাদের ছাড়াইয়া দিয়া

সে ভার মা স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। আমিও মার সঙ্গে বাবা মহাশয়ের সেবা করিতাম। ঐ সময় একখানি নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি কিনিয়া শিব-পূজা করিতাম।

অতি প্রত্যূষে সকলের আগে উঠিয়া স্নান করিতাম; মালিনী পূজার ফুল দিয়া যাইত; আমি চন্দন ঘসিয়া পূজার আয়োজন করিয়া লইয়া পূজায় বসিতাম। তখন আমার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইত। পূজা শেষ হইলে আমি যাইয়া বাবা মহাশয়ের সেবা করিতাম। বাবা মহাশয়ের প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ শেষ হইলে বাবা মহাশয় যখন পাঠে নিযুক্ত হইতেন, তখন আমি যাইয়া মার জলখাবার পান ইত্যাদি দিয়া আসিতাম। মা গৃহকর্ম্মে যাইতেন। আমি আবার বাবা মহাশয়ের সেবায় নিযুক্ত হইতাম। আমার সকল কার্য্য শেষ হইলে দিদিমার কাছে যাইয়া পড়িতাম।

মা ও দিদিমা জয়মঙ্গলবার ও ইথুপূজা

প্রভৃতি ব্রত করিতেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে ঐ সব ব্রত করিতাম।

আমার পিতা সেখান হইতে অন্যত্র যাইবার জন্য অল্প ভাড়ায় একটি বাড়ী খুঁজিতেছিলেন। আহিরিটোলায় একটি দুমহল বাড়ী ৪০৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় স্থির হইল। সেটা ভূতের বাড়ী বলিয়া কেহ ভাড়া না লওয়ায় তাহা "পড়ো" হইয়া পড়িয়াছিল। সেই বাড়ীটা বাবা মহাশয় ভাড়া লইয়া তাহার সংস্কার করিতে বলিয়া দিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া মাকে বলিলেন, একটা বড় বাড়ী পাইয়াছি, তাহা ভূতের বাড়ী বলিয়া কেহ ভাড়া নিতনা, সেই-টেকে আমি সারাইতে বলিয়া দিয়া আসিয়াছি। সেই কথা শুনিয়া আমার মনে মনে বড় ভয় হইতে লাগিল। আমার অভ্যাস নয় যে মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলি, কাজেই সেই ভাব আমার মনে চাপিয়া রাখিলাম। তার পর আমরা সকলে সেই বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম।

বাড়ীটা বড়, স্বভাবতই একটু ভয় ভয় করিত তার উপর ভূতের কথা শুনিয়া সর্ব্বদাই আতঙ্কিত থাকিতাম।

আমরা যে দিন সে বাড়ীতে যাইলাম সেই দিন আমাদের বাগানের একটি চাকর আমাদের কাছে চাকরী করিবার জন্য কাঁদিতে লাগিল; বাবা মহাশয় তাহাকে বলিলেন, আমার এখন সে সময় নাই যে তোমাকে মাইনে দিয়ে রাখব, তবে তুমি অন্যত্র চাকরীর চেষ্টা কর যে কদিন না জোটে সে কদিন এখানে থাক, খাও।

বাহিরের ঘরে সে একাকী শয়ন করিত। তাহার কাছে ভূতের কোন কথা বলা হয় নাই, তাই সে একাকী শয়ন করিত। আমাদের এই বাড়ীর একটা বড় ঘরে প্রত্যহ রাত্রে ঢিল পড়িত, সেই ঘরের সার্সিটি ভাঙ্গা ছিল, তাহার ভিতর দিয়া ঢিল ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িত। দুই তিন দিন এইরূপ ঢিল পড়ার পর বাবা মহাশয় সেই চাকরকে বলিলেন যে আজ তুই

আর আমি ঐ ঘরে শুইব। তখন সেই চাকর কিছুতেই শয়ন করিতে চাহিল না। সে বলিল, ওহি ঘর মে শয়তান হ্যায় ইটা ফেক্‌তা হ্যায় হাম উস্ ঘর মে নেহি সোয়েঙ্গে। বাবা মহাশয় তাহাকে অনেক করিয়া বলিলেন, তোর ভয় কি আমার কাছে থাক্‌বি। তাহাতে সে রাজি হইল। বড় ঘরে, এক প্রান্তে বাবা মহাশয়ের শয্যা প্রস্তুত হইল। বাতি ও দেশলাই রাখিয়া বাবা মহাশয় সেই ঘরে শয়ন করিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তুড়দাড় শব্দে ঘরে ইঁট পড়িতে আরম্ভ হইল। তখন বাবা মহাশয় বাতি জ্বালিয়া এমনভাবে আনিলেন যে বাহির হইতে সে ঘরে যে আলো আছে জানা গেল না।

জানলার কাছে আলো আনিতেই দেখিতে পাইলেন, পাশের বাড়ীর পাইখানার ছাতে দাঁড়াইয়া উলঙ্গ হইয়া এলোচুলে একজন ইঁট ফেলিতেছিল; বাবা মহাশয়কে দেখিয়া সে দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। তাহার পর দিন

অনুসন্ধানে জানা গেল যে এই বাড়ীর পাশের বাড়ীতে কতকগুলি পতিতা স্ত্রীলোক থাকে, তাহারাই প্রেতাত্মা সাজিয়া এই বাড়ীতে ভাড়াটিয়া থাকিতে দিত না। সেই দিন বাড়ীওয়ালাকে ডাকাইয়া তাহাদের বিধিমত ভয় দেখানর পর হইতে আর তাহারা ওরূপ করিত না। কিন্তু তাই বলিয়া সে বাড়ীতে যে ভূত ছিল না তাহা নহে, কারণ ভূত অনুগ্রহ করিয়া একদিন আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় একাকী একটা ঘরে ছিলাম, সে ঘরটা তিনটী কাঠের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হয়; দেখিলাম, আমার ছোট বোনের মত কিম্বা তাহার অপেক্ষা কিছু বড় হইবে এলো চুলে কে হিঃ হিঃ শব্দে হাসিয়া চকিতে পলাইয়া গেল। কাঠের সিঁড়ি দিয়া নামিবার শব্দ শুনিলাম। আমি ভাবিলাম আমার বোন সুষমা বুঝি আমায় ভয় দেখাইয়া গেল, তাই আমি ভীত না হইয়া দিদিমা দিদিমা বলিয়া ডাকিতে

ডাকিতে দিদিমার কাছে গিয়া দেখি দিদিমা আহ্নিক করিতেছেন, সুষমা তাঁহার কাছে বসিয়া আছে। আমি দিদিমাকে বলিলাম, সুষমা আমাকে ভয় দেখাইয়া আসিয়াছে। দিদিমা বলিলেন, কখন ? আমি বলিলাম এই মাত্র। তাহাতে দিদিমা অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ওমা ওতো আধ ঘণ্টা আমার কাছে বসিয়া আছে ও তোমায় ভয় দেখায় নাই। দিদিমা যেই ঐ কথা বলিলেন তখনই আমার এত ভয় হইল যে বুকের মধ্যে গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল, আমি সেখানে বসিয়া পড়িলাম, সর্ব্বশরীর দিয়া ঘর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল। দিদিমা তাঁহার জপের মালা আমার মাথায় দিয়া বলিলেন, রাম নাম কর, ঈশ্বরের নামে কোন ভয় থাকে না। ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে মনে বল আসিল। মার কাছে গিয়া ভয় পাবার কথা বলিলে মা বলিলেন, ও কিছুই নয়, সন্ধ্যার সময় একলা ছিলি তাই

মনে মনে ভয়ে ঐরূপ দেখিয়াছিস্, আর কখন একলা থাকিস্‌নে। মা আমায় সাহস দিবার জন্য ঐ কথাগুলি বলিলেন। সেই অবধি আমি আর সন্ধ্যা বেলায় মার ও দিদিমার কাছ-ছাড়া হইতাম না।

তখন আমি ও দাদা আর আমাদের ছুটি ভাই হইয়াছিল। সেই সময় হইতে মা আমায় গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। তিনি রান্নাঘরে একটি আসনে আমাকে বসাইয়া রাখিতেন ও যে সকল অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিতেন আমি সেই সকল দেখিয়া দেখিয়া শিখিতাম। পরে মা জিজ্ঞাসা করিয়া আমার পরীক্ষা লইতেন। এইরূপে ছয় মাসে সমস্ত গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দিয়া পড়িবার জন্য অবসর দিলেন। একদিন বৈকালে আমাদের সেই এঁড়েদহস্থ বাগানের পণ্ডিত মহাশয় অনেক অনুসন্ধান করিয়া আমাদের বাড়ী আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের সকলেরই আনন্দ হইল। তিনি আমাদের পরি-

বারভুক্ত হইয়া রহিলেন। অন্য যায়গায় গৃহ-শিক্ষকতা করিয়া যাহা পাইতেন তাহা বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতেন। ঐ সময় আমি বাংলা ব্যাকরণ সীতার বনবাস মেঘনাদবধ কাব্য প্রভৃতি পড়িতাম। ঐ সময় হইতে আমি কাব্য পাঠ করিয়া কিছু কিছু রসবোধ করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই সময় আমি জগতে ঈশ্বরের চক্ষু নামে একটি কবিতা লিখিয়া ভয়ে ভয়ে পণ্ডিত মহাশয়কে দেখাইতে লইয়া যাই। ঐ ভয়টা আমার প্রকৃতিগতই ছিল। পণ্ডিত মহাশয় বড় রহস্য-প্রিয় লোক ছিলেন। আমার কবিতা দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, এ যে তোমার গুরুমারা বিদ্যে হয়েছে! বলিয়া

হাসিতে হাসিতে বাবা মহাশয়কে আমার কবিতাটি দেখাইয়া বলিলেন, দেখুন গুরুর রচনা শক্তি নাই শিষ্যের হইয়াছে। বাবা মহাশয় দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন যে প্রথমে যখন এত ভাল রচনা করিয়াছ তখন চেষ্টা করিলে আরো ভাল লিখিতে পারিবে। আমি বাবা মহাশয়ের কাছে উৎসাহ পাইয়া আরো অনেক কবিতা লিখি। তন্মধ্যে কতকগুলি এইখানে উদ্ধৃত করিলাম।

জগতে ঈশ্বরের চক্ষু।

হে মানব পাপ করি কোথা লুকাইবে ?
জগতে তাঁহার চক্ষু দেখনা ভাবিয়ে !
অন্ধকার গিরিগুহা খনির ভিতর
যেখানে যাইবে তুমি সেখানে ঈশ্বর।
পাপ করি মনে মনে রাখ লুকাইয়া
মনেতে আছেন তিনি লবেন জানিয়া।

তিনি হন আমাদের হৃদয়ের স্বামী
আমাদের আত্মা তাঁর হয় অনুগামী।
প্রবৃত্তির স্রোতে মোরা যাই যবে ভেসে
ধর্ম্ম না সহায় হলে রক্ষা পাই কিসে?
তাঁহার করুণাধারা সেথানেতে বহে,
ধর্ম্মকে সহায় দেন উদ্ধার উপায়ে।
পাপেতে মোদের আত্মা হইলে মলিন
ভয়ে ভীত হই সদা অনুতাপে ক্ষীণ।
সেথানেও হন তিনি মোদের সহায়,
অজ্ঞান তিমির নাশি জ্ঞানের উদয়।

ধর্ম্ম।

দিন দিন কর তুমি ধন উপার্জ্জন,
মনে মনে ভাব তুমি, কে পায় এখন!
জাননা কালের কাছে নাহি ধনমান,
ধর্ম্মই কালের কাছে অমূল্য রতন।
তাই বলি, কর তুমি ধর্ম্ম উপার্জ্জন,

এই সব পড়ে রবে, সহ রোগ শোক
ধর্ম্মই তোমার সহ যাবে পরলোক।

প্রকৃতি।

প্রকৃতি নূতন শোভা করেছে ধারণ,
ফলে ফুলে সাজিয়াছে কুসুম কানন।
বসুন্ধরা সাজিয়াছে নবদুর্ব্বাদলে
মোহিছে মানবমন পাপিয়ার দলে।
ধীরে ধীরে বহিতেছে মধুর মলয়
ফুলবাসে মানবের মন হরে লয়।

রজনীর শোভা।

ধীরে ধীরে বহিতেছে
জাহ্নবীর ধারা,
আকাশে ফুটিয়া আছে
আকাশের তারা
কাননে ফুটিয়া আছে
কাননের ফুল,

অনিল আনিয়া গন্ধ
করিছে আকুল।
জলেতে ফুটিয়া আছে
কুমদিনীবালা
পবন তাহার সহ
করিতেছে খেলা
হেরিয়া নিশীথ শোভা
মুগ্ধ প্রাণমন,
শান্ত শিব রূপে তুমি
দিলে দরশন।

ফুল।

তুইলো কাননবালা
কুসুম সুন্দরী,
ফুটে থাক যবে তুমি
বন আলো করি,
হেরে তোর বিমোহিনী
রূপ মনোহর,

কত যে আনন্দ হয়
হৃদয়ে আমার।
কোমলতা পবিত্রতা
একাধারে পাব কোথা
তোর মত এমন সুন্দর।
বঙ্গ বালা কম-করে
দেবতা পূজার তরে
তোমারে চয়ন করে
হরিষ অন্তর প্রজাপতি
মনসুখে ঘুমায়
তোমার বুকে, মধু
দিয়া তুমি তারে
করলো আদর।
বর বধূ দুইজনে বাঁধে
যবে প্রেমের বাঁধনে
সেখানেও আছ তুমি
কুসুমের হার।

ঐ সময়ে আমি আমার পিতার কাছে কাব্য

সম্বন্ধে আমার স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতাম। এক এক দিন সন্ধ্যাবেলায় বাবা মহাশয় কাব্য আলোচনা করিতেন। আমিও তাঁহাদের কাছে থাকিয়া সেই আনন্দের ভাগী হইতাম। মা ও দিদিমারা অনন্ত প্রভৃতি ব্রত করিতেন আমাদের কুল-পুরোহিত ব্রত কথা সংস্কৃতে বলিতেন। আমি তাহা মা ও দিদিমাকে বাংলাতে বুঝাইয়া দিতাম। আমি সংস্কৃত না পড়িয়া বুঝিতে পারিতাম। আমাদের পুরোহিত এই দেখিয়া আমায় অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ও মাকে বলিতেন যে তোমাদের এ মেয়ে শাপ ভ্রষ্টা।

একদিন সকাল বেলায় মা ও বাবামহাশয় আমার বিবাহের কথা বলিতেছিলেন শুনিয়া আমার মনে ভয়ানক কষ্ট হইল ও কান্না আসিল। আমি একাকী বাহিরের ঘরে যাইয়া নির্জ্জনে কাঁদিতে ছিলাম এবং ভাবিতে ছিলাম যে মা আমাকে বাড়ী হইতে বিদায়

করিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? কিয়ৎক্ষণ পরে আমি চোখ মুছিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, একজন অল্প বয়সের সুন্দর চেহারার লোক আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরণে কালাপেড়ে ধবধবে ধুতি ও গায়ে পরিষ্কার পাঞ্জাবি ও উড়ানি। পায়ে কালো বার্ণিস করা জুতা, মাথার চুল কোঁকড়ান সিঁথিকাটা। আমি ফিরিলেই সে হাঁসিয়া বলিল, তুমি যে জন্য কাঁদিতেছ আমি সেই জন্য আসিয়াছি। আমি তোমার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছি, বলিয়া মুখটিপিয়া হাসিতে লাগিল। আমি হঠাৎ একটা লোককে দেখিয়া ভয় পাইয়া বলিলাম, আপনি সরুন, আমি বাবা মহাশয়কে ডেকে দিচ্ছি। তাহাতে সে আমাকে কিছু না বলিয়া সেইখানে সেইভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি তখন তাহাকে পুনরায় মিনতি করিয়া বলিলাম আপনি সরুন, আমি গিয়া বাবা মহাশয়কে

ডাকিয়া দিই। তখন সে দুইহাত প্রসারিত করিয়া আমার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। তখন আমি মনে মনে ভাবিলাম যে এখান হইতেই চিৎকার করি। মুখে কিছু বলি নাই যেই এই কথা ভাবিয়াছি অমনি সে হাত সরাইয়া আমাকে যাইতে বলিল। তখন আমি সংকোচের সহিত আমার কাপড় সামলাইয়া বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া গিয়া বাবা মহাশয়কে তাড়া তাড়ি বলিলাম বাহিরে কে একজন লোক আসিয়াছে আপনি যাইয়া দেখুন। বাবা মহাশয় এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিলেন; আসিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বরাবর সিঁড়ি দিয়া রাস্তার মোড় অবধি দেখিয়া আসিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। বাহির হইতে কেহ আসিয়া এত শীঘ্র চলিয়া যাইতে পারে না, আর যদি বা বাহির হইতে কেহ আসিত ; তবে সে আমার মনের কথা কিরূপে জানিতে

পারিবে? ইহা অলৌকিক ঘটনা ভিন্ন আর কিছুই নহে, মা ও বাবামহাশয় এই সিদ্ধান্ত করিলেন।

আর একটি হাস্যকর ঘটনা। একদিন আমাদের বাড়ীতে বৈকালে অপরিচিতা তিনটি স্ত্রীলোক আসিলেন। আমরা তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া আসিয়া বসাইলাম। তাঁহারা কিছুতেই আপনাদের পরিচয় দিলেন না তবে তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, এইটি আমার মাসী ও দ্বিতীয়টি আমার পুত্রবধু। তখন আমরা সেই ভূতের বাড়ী ছাড়িয়া চোর বাগানে একটি বাড়ীতে বাস করিতাম। নবাগতা রমণীগণ যদিও তাঁহাদের নিজের পরিচয় দিলেন না কিন্তু তাঁহাদের কথা-বার্ত্তায় বোঝা গেল যে তাঁহারা আমাদের সকলকেই চেনেন। নানা প্রকার গল্প সল্প ও কথা বার্ত্তার পর আমাদের সেদিন কি রান্না হইয়াছিল সেই বিষয় জিজ্ঞাসা

করিলেন। রান্নার কথা বলিবার সময় মা বলিয়াছিলেন যে ইঁচোড়ের দালনা হইয়াছে। মার মুখ হইতে ইঁচোড় কথাটি বাহির হইবা মাত্র ইঁ-ইঁ-চোড় আবার কি বলিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মা ও অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। মাকে তদবস্থায় দেখিয়া আমার মনে আঘাৎ লাগিল। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কি বলেন? তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন আমরা বলি এঁচোড়। আমিও তাঁহারই মতন সুরে বলিলাম এঁ্যা-এঁ্যা-চোড় আবার কি?—বলিয়া না হাসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তিনিও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। পরে তাহারা বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া তবে নিজেদের পরিচয় দিলেন তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহারা বাবা মহাশয়ের এক বন্ধুর পরিবারের লোক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এখন হইতেই আমার বিবাহের চেষ্টা চলিতে লাগিল। মা ইহাকে উহাকে বলিয়া যত সম্বন্ধে আনিতেন বাবা মহাশয় নানা ওজর আপত্তি তুলিয়া তাহাদের ফিরাইয়া দিতেন। এই রকম করিয়া তের বৎসর কাটিয়া গেল। ঐ সময়ের মধ্যে আমি রামায়ণ, মহাভারত, সুশীলার উপাখ্যান প্রভৃতি ভাল ভাল বই অনেক পড়িয়াছিলাম। ঋজুপাঠ নামে সংস্কৃত বইখানিও পড়িয়াছিলাম।

একদিন আমার পিসতুত ভগিনী আসিয়া মাকে বলিলেন যে এবার আমি একটি ভাল পাত্রের সন্ধান পাইয়াছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য, তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, চরিত্র খুব ভাল ও কবি। এমন আর পাওয়া যাইবে না। এবার আর যেন মামা মহাশয় অমত না করেন। তুমি বলিয়া কহিয়া মত করিও।

এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। পরে বাবা মহাশয় বাড়ীতে আসিলে মা তাঁহাকে দিদি যাহা বলিয়াছিলেন সেই কথা বলিলেন। বাবা মহাশয় সমস্ত শুনিয়া চুপ করিরা রহিলেন! তাহা দেখিয়া মা বলিলেন, তুমি যে চুপ করিয়া রহিলে? কত পাত্র এল কাহাকেও মনে ধরিল না, তবে তুমি কি মনে করিয়াছ মেয়ের বিবাহ দিবেনা? বাবা মহাশয় বলিলেন, আমিত সব শুনিলাম তার পর ভাবিয়া দেখি, যাহা হয় করিব। তাহার পর দিন দিদি আসিয়া খবর দিলেন যে সে পাত্রটি মাঘোৎসব করিতে চুঁচুড়া হইতে জোড়াসাঁকোয় আসিয়াছে ইহা শুনিয়া মা বাবামহাশয়কে সেই দিনই জোড়াসাঁকোয় পাঠাইয়া দিলেন। বাবা মহাশয় জোড়াসাঁকো যাইয়া পাত্র দেখিয়া আসিলেন এবং তাহার পরদিন পাত্রটি আমাকে দেখিতে আসিবেন এইরূপ কথা ছিল কিন্তু সেদিন কোন সঙ্গী না পাওয়ায় একাকী আসিতে পারিলেন না। তাহার

পর দিন বৈকালে আমার পিসে মহাশয়ের সঙ্গে আসিবেন বলিয়া একখানি চিঠি লিখিলেন—এই চিঠি পাইয়া অবধি ভয় ও লজ্জায় আমার বুকের ভিতর ধড় ধড় করিতে লাগিল ও আমি কি করে সম্মুখে বাহির হইব এই ভাবনাই বার বার মনে হইতে লাগিল। সে দিন বৈকালে খুব ঝড় হইয়াছিল বাহিরেও ঝটিকা আর আমার হৃদয়ের মধ্যেও ভাবনার ঝটিকা বহিতেছিল। যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে ঝড় থামিলে মেঘও কাটিল তথন তিনি আমার পিসে মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া আমাদের বাড়ী আসিলেন।

আমি ভাবিতে ছিলাম যে আমার এই দর্শন রূপ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিলেই বাঁচি। পরে তিনি উপরে আসিলেন, দিদিমা আমাকে লইয়া সেইখানে গেলেন, তিনি আমাকে দু একটি পদ্য ও গদ্য পড়িতে দিলেন; এবং আর দু একটি প্রশ্ন করিবার পর আমি

অব্যাহতি পাইলাম। তিনি জলযোগ করিতে বসিলেন সেখানেও দিদিমা আমাকে ডাকিয়া বসাইলেন—কি দায়! তিনি জলযোগের পর নিচে যাইয়া বাবা মহাশয়কে বলিলেন যে আমি মহর্ষির কাছে যাইয়া পরে আসিয়া দিনস্থির করিব। এই বলিয়া ১১ই মাঘ সারিয়া চুঁচড়ায় ফিরিয়া গেলেন, তাহার পরে আসিয়া ৯ই ফাল্গুন দিন স্থির করিয়া জোড়াসাঁকোস্থ সকলকে এবং বাবামহাশয় ও দাদাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পুনরায় চুঁচড়ায় চলিয়া গেলেন। মহর্ষি সমারোহ করিয়া তাঁহার দীক্ষা দিলেন, এই দীক্ষার দিনে মহর্ষি তাঁহাকে যে উপদেশ দেন তাহা অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে ছাপা রহিয়াছে। দীক্ষা হইয়া যাইবার পর তিনি একবার দেশে যান পরে দেশ হইতে কলিকাতায় আসেন। আমার বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল, চিন্তার তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া আমার হৃদয়ে আঘাৎ করিতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল যে

আমার মতন একটা অপদার্থকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন। (আমি এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক, খেতে ভুলে যাই, কাজ কর্ম্ম করিতে ভুলে যাই, যদি কেহ আমাকে বলে কাঁদিস্ না আমি অমনি কাঁদিয়া ফেলি, কাহারও কষ্টের কথা শুনিলে কাঁদিয়া আকুল হই, আকুল ক্রন্দনেও হৃদয়ে শান্তি আসিত না। কেহ জোরে কথা কহিলে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত—এই সব দেখে শুনে মা আমায় বলিতেন তোর দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদিবে—সেই কথা মনে হইয়া আমার ভাবনা হইতেছিল।)

একটি বড় বাড়ীতে বিবাহের জন্য বাবা মহাশয় আমাদের লইয়া যান। বিবাহের দিন সকাল বেলায় গাত্র হরিদ্রা হইবার পর তিনি আমাকে একখানি পুস্তক উপহার দিয়া বহির্বাটিতে চলিয়া গেলেন। উৎসব আনন্দে আত্মীয় স্বজনে বাড়ী পূর্ণ—আমি একাকী

নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তায় মগ্ন ছিলাম, ভাবিতে-ছিলাম যে এই উৎসব আনন্দের মধ্যে আমার হৃদয় কেন বিষাদে পূর্ণ, সকলেরই ত বিবাহ হয়, সকলকেই ত পিতা মাতাকে ছাড়িয়া যাইতে হয়, তবে আমার হৃদয় কেন বিষাদে পূর্ণ ? এইরূপ কিছুক্ষণ চিন্তা করিবার পর যেমন উঠিলাম অমনি মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া দেওয়ালে মাথায় আঘাৎ পাইলাম। পরে মার কাছে যাইয়া দেখিলাম যে মা ও আমার ভগ্নিরা সকলে মোনা মুনি ভাসা-ইতে ব্যস্ত। মোনা মুনি এক প্রকার ক্ষুদ্র ফল, ফল দুটি জলে ভাসাইয়া নব দম্পতির ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখের সম্ভাবনা জানিবার চেষ্টা করা হয়, ফল দুটি জলে ভাসিয়া একত্রিত হইলে শুভ ও তাহার বিপরীত অশুভ। মা ও ভগ্নিরা জলে মোনা মুনি ভাসাইয়া সতৃষ্ণ নয়নে দেখি-তেছিলেন যে জোড়া লাগে কিনা, মোনা মুনি জোড়া লাগিল। তখন সকলে হাই-আমলা প্রভৃতি অন্যান্য অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ

করিলেন। এতক্ষণ আমাকে ছাড়িয়া অন্যান্য অনুষ্ঠান হইতেছিল সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় মা আমাকে ডাকিলেন, এইবার আমার পালা আরম্ভ হইল। কনে সাজান নাওয়ান ইত্যাদি শেষ করিয়া আমাকে সকলে মিলিয়া ঘিরিয়া বসিলেন ও নানাপ্রকার রহস্যালাপ চলিতে লাগিল। মা আমাকে পূর্ব্ব হইতে বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে শুভ কর্ম্মে আমি যেন চখের জল না ফেলি, কারণ মা জানিতেন যে চোখের জল আমার কাছে বড় সুলভ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এমন সময় বর আসিতেছে, বর আসিতেছে বলিয়া একটা গোলযোগ উঠিল, যাহারা আমার কাছে বসিয়া ছিল তাহারা সকলে বর দেখিতে চলিয়া গেল ও বর দেখিয়া ফিরিবার সময়

বলিতে বলিতে আসিতেছিল বর বড় অন্ধকার, কারণ তাহারা মনে করিয়াছিল যে, আলোক-মালায় সজ্জিত নানাবিধ বাজনা বাদ্য সহযোগে বর দেখিতে পাইবে, তাহার বিপরীত দেখিয়া তাহারা নিরুৎসাহে বলিতেছিল বর বড় অন্ধ-কার।

পরে স্ত্রী-আচার শুভদৃষ্টি মাল্যবিনিময় আদি যথা নিয়মে সম্পন্ন হইল। এইবার সম্প্র-দান হইবে। তখন আমার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল, পা আর চলে না, আমার এক ভগিনীপতি আমার হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। আমরা যথা নিয়মে আসন গ্রহণ করিবার পর সম্প্রদান আরম্ভ হইল, আমার শীতল ও লজ্জা-কম্পিত হস্ত উঁহার হাতে স্থাপন করাতে আমার প্রাণে একটা নির্ভরের ভাব আসিল। পরে সম্প্রদান শেষ হইলে আমরা উভয়ে উপ-রের একটি সজ্জিত কক্ষে বসিলাম। আমার ভগিনীরা উঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলেন।

নানাপ্রকার রহস্যাদি হইবার পর আমরা নিদ্রিত হইলাম। পর দিন প্রাতে উদীচ্য ক্রিয়াদি করিয়া তৎপরদিন চুঁচুড়ায় চলিয়া গেলেন ও তাহার ৫।৭ দিন পরে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিলেন। বাবা মহাশয় কাপড় বাক্স ইত্যাদি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিলেন, মা বাক্সেতে এটা সেটা দিয়া সাজাইতেছেন ও এক একবার আমার দিকে স্নেহ-বিগলিত নয়নে চাহিতেছেন। আমার সে সব দিকে লক্ষ্য নাই, কেবল ভাবিতেছি কি করিয়া সকলকে ছাড়িয়া থাকিব।

দিন সুখেরই হউক আর দুঃখেরই হউক দিন কাহারও মুখাপেক্ষা করে না! সে দিন গেল, প্রভাত হইল, আমার ভগিনী ছলছল নেত্রে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, আমি নীরবে বক্ষে ধরিলাম। ঝর্‌ঝর্ করিয়া চোখে জল পড়িতে লাগিল কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতস্থ হইয়া

সুষমাকে বলিলাম—ভাই, বাবামহাশয়ের সেবা করো ও মায়ের সাহায্য করিও আমার অভাব যেন ওঁরা না বোধ করেন। স্ত্রীলোক যাহার জন্য সৃষ্ট, যেখানে তাহার গতি, আমি সেইখানে চলিলাম; এতদিন এখানে আমার যাহা কর্ত্তব্য ছিল আজ তাহা শেষ হইল, আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হও।

আহারাদি করিয়া বেলা দুইটার ট্রেণে আমাদের যাইতে হইবে, পণ্ডিত মহাশয় আমাদের পৌঁছাইতে যাইবেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, প্রণাম ও আশীর্ব্বাদের পর চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে গাড়ীতে যাইয়া বসিলাম। গাড়ী জনাকীর্ণ হাবড়া ষ্টেসনে আসিয়া থামিল, আমি ইতিপূর্ব্বে কখন রেলে চড়ি নাই বা ষ্টেসনেও আসি নাই সুতরাং ভিড় দেখিয়া আমার বড় লজ্জা করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে রেল আসিতে আমরা তাহাতে উঠিলাম ও চুঁচড়ার ষ্টেসনে আমরা নামিলাম।

সেখানে ঘোড়ারগাড়ী লইয়া মহর্ষির সরকার অপেক্ষা করিতেছিল আমরা সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া মহর্ষির বাড়ীর ফটকে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, নিস্তব্ধ বাড়ী আমাকে নীরবে বরণ করিয়া লইল।

উনি আসিয়া চারি টাকা আমার হাতে দিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে প্রণাম করিতে বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয় সেই চারি টাকা পাইয়া গঙ্গা পার হইয়া বাড়ী গেলেন।

পরদিন সকাল বেলায় কর্ত্তাদাদামহাশয় বেড়াইয়া আসিয়া আমাদিগকে ডাকিলেন আমরা প্রণাম করিলে আশীর্ব্বাদ করিয়া পূর্ব্বে রক্ষিত পাশাপাশি দুইখানি চৌকিতে বসিতে অনুমতি করিলেন। আমরা বসিবার পর সস্নেহে আমাদের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার শান্ত উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া আমার হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হইয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিল! তাঁহাকে. আমি একবার খুব ছোট বেলায়

দেখিয়াছিলাম আর এই দেখিলাম। সেই দিন থেকে তিনি আমাকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও আমাকে বলিয়া দিলেন—প্রতি বুধবার সন্ধ্যার সময় আমার কাছে আসিবে আমি তোমাকে ধর্ম্ম উপদেশ দিব ও কথাবার্ত্তা কহিব।

সেই হইতে এক বুধবার আমাকে মন্ত্র দেন। আমি একদিন তাঁহাকে পুনর্জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করি তাহাতে তিনি এই কথা বলেন যে মনুষ্য মরিয়াই যে ইহলোকে আসিতে হইবে একথা আমার মনে হয় না, অনন্ত লোকলোকান্তর মধ্যে যে কোন লোকে হউক জন্ম লইবে।

আমি যখন চুঁচুড়ায় ছিলাম তখন আমার কাছে একজন দাসী ছিল, তাহার বর্দ্ধমানে বাড়ী, তাহার নিকট অনেক ছড়া শিখিয়াছিলাম তাহার মধ্যে দু-একটি এইখানে লিখিলাম। তাহা-দের দেশে ভাঁজু ও ভাদু বলিয়া দুই রকম পূজা হয় একটা নিশীথে ও একটা দিনে। ভাঁজুটা নিশীথের পূজা সেই ভাঁজুর ছড়া

এইখানে উদ্ধৃত করিলাম। ভঁাজু পূজায় পুরুষেরা কেউ যেতে পারে না, মেয়েরা নাচে ও গান করে। তবে পুরুষেরা যে লুক্কা-ইত ভাবে সেই উৎসবে যোগ না দেয় তা নয়, তবে প্রকাশ্যে যোগ দিতে পারে না, কারণ সেটা মেয়েদের উৎসব।

ভাঁজুর ছড়া।

এক কলসি গঙ্গাজল
এক কলসি ঘি।
বৎসর অন্তর আসেন ভাঁজু,
নাচব না ত কি ॥ ১
ভঁাজু লো কলকলানি,
মাটির লো সরা।
ভাঁজুর গলায় দেব আমি
পঞ্চ ফুলের মালা ॥ ২
পূর্ণিমার চাঁদ দেখে
তেঁতুল হল বক্ক।

গড়ের গুগুলি বলে
আমি হব শঙ্খ ॥
ওগো ভাঁজু
কি করতে পারো।
আইবুড়ো ছেলের
বিয়ে দিতে নারো ॥ ৩

তার পরদিন সকালে ভাঁজুর বিসর্জ্জন হয় তার ছড়া—

এই পথে যেও ভাঁজু,
এই পথে যেও।
বেনা গাছে কড়ি আছে,
দুধ কিনে খেও ॥ ১
ঐ পথে যেও ভাঁজু,
ঐ পথে যেও।
বেনা গাছে কড়ি আছে,
সন্দেশ কিনে খেও ॥ ২

ইত্যাদি—ইত্যাদি—ইত্যাদি ॥

এই গেল ভাঁজুর ছড়া। আর ভাদুর ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন, কি অন্য কোন দিন, পূজা হয় তাহা ঠিক আমার মনে নাই, তবে তাহাদের মধ্যে দুই দলে ছড়া কাটাকাটি হয় তাহার দুই একটি নমুনা দিলাম—

আমার ভাদু নেয়ে এল,
পরতে দেব কি ?
ঘরে আছে পাটের শাড়ি,
বার করে দি।
ওদের ভাদু নেয়ে এল,
পরতে দেব কি ?
ঘরে আছে ছেঁড়া কানি,
বার করে দি ॥ ১

অপর পক্ষের লোক গাহিল—

আমার ভাদু নেয়ে এল,
খেতে দেব কি ?
ঘরে আছে খাসা মণ্ডা,
বার করে দি ॥

ওদের ভাদু নেয়ে এল,
খেতে দেব কি ?
ঘরে আছে পচা মণ্ডা,
বার করে দি ॥ ২

আর ভাদুর দু-একটা গানও লিখিলাম বোধ হয় পাঠকের নিতান্ত অপ্রীতিকর হইবে না—

গীত।

নীচে কোটা উপর কোটা,
মধ্যে কোটা ইঁদারা।
আমার ভাদু দালান দিচ্ছে,
সুরকী কুটতে যাস তোরা ॥
সুরকী কোটা যেমন তেমন,
ইটে কোটা ভার হল।
কেমন করে ঘর যাব ভাদু,
মেঘ নেমে আঁধার করে এল ॥ ১

চালে ধরে চালকুমড়ো,
ভুয়ে ধরে কদু।
হাট-তলা দিয়ে ডাক ডাকছে,
সেই পরাণের বঁধু॥ ২
ঠাকুরবাড়ির কাল তুলসী,
পাতা ঝরঝর করে।
ঠাকুর গেছেন পরবাস,
মনটি কেমন করে॥
কেষ্ট গেছেন বিষ্ণুপুর,
না বলা করিয়ে।
আদেক রাতে এলেন,
কেষ্ট পাঁচুনি হারায়ে॥
সে কেষ্ট ফেরেন বনে বনে।
রক্তকুশেরী কাঁটা ফুটিল চরণে॥
হাতে কম্বল তেলের বাটি,
কানে কদম ফুল।
আমার কেষ্ট নাইতে যাবেন,
কালিদহের কূল॥ ৩

ভাঁজু ও ভাদু পূজাতে বৰ্দ্ধমানের গ্রাম্য স্ত্রীলো-
কেরা এই সব ছড়া গান করে।

এইরূপ করিয়া একমাস কাটিয়া যাবার পর
উনি আমাকে আমার পিত্রালয়ে লইয়া আসেন।
আমি আসিবার দিন কৰ্ত্তাদাদামহাশয়কে প্রণাম
করিয়া বিদায় লইলাম তিনি আমাকে আশীৰ্ব্বাদ
করিয়া বলিলেন—যাও, আবার শীঘ্র আনিব।
উনি আমায় কলিকাতায় আমাদের বাড়ীতে
রাখিয়া, ১লা বৈশাখ নব বর্ষের উপাসনা শেষ
করিয়া, চুঁচড়ায় চলিয়া গেলেন। আমি একমাস-
মার কাছে রহিলাম, পরে আষাঢ় মাসে উনি
আসিয়া আবার আমাকে চুঁচড়ায় লইয়া গেলেন।
এবার আমাকে আর একটা স্বতন্ত্র বাড়ীতে
লইয়া গেলেন। আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম তাহা
তখন সংস্কার হইতেছিল, বাড়ীর বাগানটি
নানা জাতীয় ফুল ফলে সুশোভিত ছিল,
উদ্যানে নানাজাতীয় ফুল ফুটিয়া বাগানটি
আলো করিয়া থাকিত, আমি দিনের বেলায়

ফুল তুলিয়া এগাছের ওগাছের ধারে ধারে ঘুরিতাম, ক্লান্ত হইলে গাছের ছায়ায় বসিতাম, ও বৈকাল হইলে ফুলময় সাজে সাজিতাম, উনি আবার সেই ফুল সাজা দেখে আমাকে বনদেবী বলিতেন। সেখানে একমাস বড় সুখেই কাটিয়াছিল কারণ সেখানে আমার ভালবাসার দুইটি জিনিষ পাইয়াছিলাম—গঙ্গা ও ফুল। একমাস পরে আমরা পুনরায় মাধব দত্তের বাড়ীতে ফিরিয়া যাইলাম এবং সেখান হইতে শ্বশুরবাড়ী ১লা শ্রাবণ রওনা হইলাম। যাবার দিন অতি প্রত্যুষে কর্ত্তাদাদামহাশয়কে প্রণাম করিতে যাইয়া দেখি একখানি ইজিচেয়ারে আবক্ষ বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া সূর্য্যের উদয় দেখিতে ছিলেন, আমরা প্রণাম করায় সময়োচিত দুই একটি উপদেশ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। আমরা গঙ্গা পার হইয়া নৈহাটিতে ট্রেনে উঠিলাম। হৃদয়পুরে আমার শ্বশুরবাড়ী, যাইতে হইলে রামনগর ষ্টেশনে নামিতে হয়,

সেখান হইতে পাল্কি বা গরুর গাড়ীতে যেতে হয়। বেলা দুই প্রহরের সময় আমাদের ট্রেন রামনগর ষ্টেশনে পৌঁছিলে আমরা দেখি যে দুইখানি পাল্কি আমাদের জন্য পূর্ব্ব হইতে অপেক্ষা করিতেছে। আমরা দুইজনে দুইখানি পাল্কিতে উঠিলাম এবং দাসীকে ও জিনিষপত্র-গুলিকে একখানি গরুর গাড়ীতে চড়াইয়া দিয়া যাত্রা করিলাম। দুইখানি পাল্কি পাশাপাশি চলিল তখন মধ্যাহ্নকাল প্রখর সূর্য্যকিরণে নিস্তব্ধ প্রান্তরে কাকের কা কা শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইতে ছিল না। এইরূপে আমরা মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম, পার হইয়া চলিলাম। একটি গ্রামের কাছে যখন পাল্কি যাইতেছিল রৌদ্রাভ্যাস্ত কতকগুলি গ্রাম্য বালক রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল, বাহক-দের শব্দে—ঐ বর কনে আসিতেছে—বলিয়া ছুটিয়া আসিল, আমার আপাদ মস্তক দেখিল. ও আমার পরণের লাল কাপড়

দেখিয়া বলিল—এই কনে যাইতেছে, আর একজন আমার পায়ে জুতা দেখিয়া বলিল—ওরে কনে নয়রে, দেখছিস্না পায়ে জুতা আছে, ও বর! তাহাদের বিচার শক্তি দেখিয়া আমি মনে মনে হাসিলাম। কিছুদূর যাইতে না যাইতে ঘুঘুর করুণস্বরে প্রাণ করুণরসে পূর্ণ হইয়া গেল, বাহকদিগের প্রতি চাহিয়া দেখি দারুণ গ্রীষ্মে তাহারা গলদঘর্ম্ম হইয়াছে, তাহাদের দেখিয়া বড় কষ্ট হইল, ভাবিলাম—দয়াময়, তোমার রাজ্যে মানুষ কষ্ট পায় কেন? আমি দিব্য পাল্কিতে আরামে যাইতেছি, আর বেচারারা পেটের দায়ে এত ক্লেশ ভোগ করিতেছে; কেহ যদি ইহাদিগকে অমনি টাকা দিত তাহা হইলে ইহাদের আর এত ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না। আমি আমার পাল্কির দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম ও নিজেও তাহাদের ক্লেশের ভাগী হইবার জন্য চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

অনেকক্ষণ পরে একটা গ্রামে বড় গাছের ছায়ায় তাহারা বিশ্রামের জন্য পাল্কি নামাইল, উনি আমার পাল্কির দ্বার বন্ধ দেখিয়া খুলিয়া দিলেন ও আমাকে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর দেখিয়া ভাবিলেন আমি ভয় পাইয়া থাকিব; বলিলেন— ভয় কি এখানে নাব, এস আমরা প্রকৃতির শোভা দেখি। তখন রৌদ্রের তেজ কমিয়াছে ও মৃদু মন্দ উষ্ণ সমীরণ বহিতেছে, বৃক্ষ অন্তরালে একটি বউ কথা কও পাখী বসিয়া ডাকিতেছে। আমি পাল্কি হইতে নামিয়া দেখিলাম দূরে নীলের ক্ষেত্রসকল নীল সতেজ গাছে পুর্ণ, আমরা সেই নীলের ক্ষেত্রে কিছু পদচারণা করিয়া পুনরায় পাল্কিতে উঠিলাম। বাহকেরা আমাদের লইয়া চলিল, আমরা গ্রাম্য শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, তখন অন্ধকারের মধ্য দিয়াই আমরা চলিলাম। এই অন্ধকারে অচেনা পথে ও অপরিচিত

স্থানে যাইতে কে জানে কেন আমার মহাযাত্রার কথা স্মরণ হইল সঙ্গে সঙ্গে একটি দীর্ঘ নিশ্বাসও পড়িল ও সেই অন্ধকারের মধ্যে আমাদের প্রিয়তমের সুন্দর হস্ত দেখিতে পাইলাম। সেই হস্ত ধারণ করিয়া আমরা জীবনের পথে ও মরণের পরপারে চলিয়া যাইব মনে করিয়া আমার হৃদয়ে শান্তি ও নির্ভর আসিল। তখন আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমাদের প্রাণের প্রাণকে ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। কতক্ষণ এই অবস্থায় ছিলাম জানি না—চাহিয়া দেখি পাল্কি আমার শ্বশুর গৃহের দ্বারে আসিয়া প্রবেশ করিল ও বাহকগণ পাল্কি নামাইল।

আমার ভাশুরঝি ও মাসাস্‌শাশুড়ি আসিয়া আমাকে বাড়ির মধ্যে লইয়া গেলেন। ১৫ দিন আমি সেখানে ছিলাম। আমার সমবয়সি ভাশুরঝির সহিত আমার বড় ভাব হইয়াছিল সে বড় ভাল মেয়ে, বড় সরলা ছিল, সে আর ইহলোকে নাই আমাকে পাইয়া

তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি আমার কাছে উন্মুক্ত করিয়াছিল তাহার সাহচর্য্যে আমার হৃদয় বিশেষ আনন্দ পাইয়াছিল। সেই জন্য তাহার দুই একটি কথা আমার বাল্যজীবনের স্মৃতির সহিত আজও জড়িত আছে।

ফিরিয়া চুঁচড়ায় আসিয়া আবার মার কাছে আসিলাম—কে জানিত এই আমার শেষ মার কাছে যাওয়া। সেই অতীত কালের স্মৃতি আজও যেন আমার প্রত্যক্ষ বোধ হইতেছে। ভবিষ্যৎ তুমি যদি বর্ত্তমানে পরিণত না হইতে, তবে অতীতের স্মৃতির মর্ম্ম পীড়া আমাকে ভোগ করিতে হইত না। স্মৃতির তীব্র বেদনায় যখন প্রাণে জ্বালা আসে তখন বিস্মৃতির সলিলে তাহা নিবারণ করিতে ইচ্ছা হয় না বিস্মৃতির অতল সলিলে ডোবা, এবং স্মৃতির মর্ম্ম জ্বালা সহ্য করা এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী পথ আর নাই; এই দুয়ের অতীত পথ আছে, তাহা ভগবান। মার কাছে ভাদ্র মাসে আসিয়াছিলাম অগ্রহায়ণ

মাসে উনি মহর্ষির সহিত ভ্রমণে বাহির হই-
লেন। উনি যখন বাহির হন তখন আমার জ্বর
বিকার হইয়াছিল। ভ্রমণে যাইবার পূর্ব্বে আমার
সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন ও রওনা হইবার দিন
আমাকে একখানি পত্র দিয়া গিয়াছিলেন, তখন
আমার জীবন মরণের অভিনয় হইতেছিল, চিঠির
একবর্ণও পড়িতে পারি নাই। পরে আমার
স্বামী বম্বে গিয়া তার করিয়া আমার সংবাদ
লন, একমাস কি দেড়মাস পরে তবে আমি
আরোগ্য লাভ করি। জীবনের যে অংশ
সুখে কাটিয়াছে তাহা বাল্যকালের পরবর্ত্তী
শোকের প্রবল আঘাতে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে,
ও সেই ভগ্নতরি এখনও ধীরে ধীরে চলিতেছে,
কবে কুল পাইব তাহা বিধাতাই জানেন। মাঘও
গেল, ফাল্গুনও যায় যায়, উনি বম্বে হইতে
আসিয়া দেশে যান। ২৩ ফাল্গুন রাতে আমার
একটি কন্যা সন্তান হয়, আমি মা হইলাম, রমণী
জীবনের এই শেষ পরিণতি, ইহাতেই রমণী

মহিমাময়ী, এইখানে প্রেম পূর্ণতা লাভ করে, দুইটি হৃদয়কে এক করিয়া দেয়। পর দিন উনি আসিলেন, মা কত আনন্দে তাঁর সেই ছোট নাতনিটিকে ওনার কোলে দিলেন, সেই সুন্দর ফুলের মত ছোট কন্যাটিকে দেখিয়া আমারও যে আনন্দ হয় নাই তাহা নয়। শিশুর সুন্দর মুখশ্রীতে আমি বিশ্বসৌন্দর্য্যের আভাস পাইতাম, মনে মনে স্বর্গসুখ ভোগ করিতাম। আমি আমার সুখস্বপ্নে মগ্ন আছি এমন সময়ে ১৬ চৈত্রে জননীকে অশেষ ক্লেশ দিয়া তাঁর এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হইল। পরে ২১ দিনে যথাবিহিত ষষ্ঠী পূজা হইয়া গেলে একদিন নিশীথে মার গায়ে হাত দিয়া দেখি ভয়ানক গরম। সেই গরম আমার হৃদয়ে যেন বৈদ্যুতিক আঘাত করিল আমি বলিলাম—মা, তোমার গা এত গরম কেন? মা বলিলেন—আমার বড় জ্বর হইয়াছে ও ঘাড়ে এত ব্যথা যে আমি উঠিতে পারিতেছি না। আমার ভগ্নীকে উঠাইয়া আগুন

করিয়া তাপ দিতে দিতে ক্রমে নিশা বঅ-
সান হইল, প্রভাত সমিরণের শীতল স্পর্শে
চিন্তাক্লিষ্ট প্রাণে শান্তি আসিল। মার ব্যথা
একটু উপশম হওয়ায় মা উঠিয়া হাত মুখ
ধুইলেন। পরে ডাক্তার আসিয়া মায়ের হাত
দেখিয়া বলিল—নাড়ীর গতি বড় এলোমেল
তোমরা ভাল ডাক্তার ডাকাও—এই বলিয়া
হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়া চলিয়া গেল। ঔষধ ও
পথ্য খাওয়ান হইল, বৈকালে ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর
ত্যাগ হইয়া গেল। পর দিন একটু ডালের যুস
ও ঔষধ খাওয়ান হইল সন্ধ্যার সময় পুনরায় জ্বর
প্রবল হইল ও বড় ডাক্তার ডাকান হইল।
ডাক্তার আসিয়া বুক পরীক্ষা করিয়া নিউ-
মোনিয়া হইয়াছে বলিয়া ঔষধ দিয়া চলে গেলেন।
আমি মার কাছে আসিয়া দেখি মা প্রলাপ
বকিতেছেন, আমাকে জোরে ডাকিয়া ওনার
নাম করিয়া বলিলেন—সে আসিয়াছে তাহার
খাবার দেখিয়া দেও। আমি কপালে করাঘাত

করিলাম, কে যেন আমার মনের ভিতর বলিতে লাগিল মা আর বাঁচিবেন না। এই মনের ভাব কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারিলাম না। চিকিৎসা চলিতে লাগিল রোগ উপশম না হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১২ দিনের দিন সকাল বেলা মার কাছে বসিয়া আছি এমন সময় মার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। মা আমাকে আরও নিকটে ডাকিয়া হাত তুলি-লেন। হাত কাঁপিতেছে দেখিয়া মার হাত আমার হাতের ভিতর লইলাম, আমার চখের-জলে মার হাত ভিজিয়া গেল, মা আমাকে বলিলেন—তুমি কাঁদিতেছ কেন আবার আমি সেরে উঠব, আবার বল পাব, তুমি জল খেয়ে এসে আমার কাছে বস। আমি বলিলাম—আমি খেয়েছি। মা বলিলেন—কেন মিথ্যে কথা বলিতেছ তোমার মুখ শুখন, যাও খেয়ে এস। অগত্যা উঠিয়া গিয়া যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আবার মার কাছে আসিয়া

বসিলাম। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। একে বৈশাখ মাস, তাহাতে বেলা দ্বিপ্রহর, মা জ্বালায় ছট ফট করিতে লাগিলেন। উত্তাপ পরীক্ষা করায় দেখা গেল ১০৭ ডিগ্রি জ্বর। জ্বালায় মা অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন—এ দাহ জ্বালা সহিতে পারে না বালা।

তখন মা অৰ্দ্ধ জ্ঞানশূন্য। কিছুক্ষণ এই জ্বালা সহ্য করিবার পর যখন রৌদ্রের তেজ কমিয়া আসিল তখন মার জ্বালাও কথঞ্চিৎ উপসম হওয়ায় তিনি নিস্তব্ধ হইলেন। ক্রমে যখন রাত ৮টা বাজিল তখন ডাক্তার জ্বর পরীক্ষা করিয়া বলিলেন ১০৮ ডিগ্রি—দেখিতে দেখিতে তাহা ৯ ডিগ্রিতে পরিণত হইল। তখন সব ডাক্তাররা বসিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন যে এত উত্তাপে লোকের প্রাণ থাকে না, এই জ্বর ত্যাগের সময় প্রাণ বিয়োগের আশঙ্কা। আমি এই কথা শুনিতে শুনিতেই অবসন্ন হইয়া

ঘরের মেজের উপর শুইয়া পড়িলাম। সেই ঘরে মা খাটের উপর ছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আমার ভগিনীর আকুল ক্রন্দনে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তাড়া তাড়ি উঠিয়া দেখি মার চখের তারা উর্দ্ধে উঠিয়াছে পেটও ফাঁপিয়াছে, ডাক্তার সেই জন্য টারপেনা-ণ্টাইন খাওয়াইতেছিল কিন্তু মা সে টুকু তখন গলধঃকরণ করিতে পারিত্তেছেন না। বাবা মহাশয় তাড়াতাড়ি ডাক্তার বেহারি বাবুকে ডাকিতে গেলেন। ডাক্তার আমাকে মার পা ধরিতে বলিলেন। ঐরূপ দুই তিনটা ফিটের পর মার শ্বাস আরম্ভ হইল। তখন ডাক্তার নীচে নামিয়া গিয়া বলিলেন—দেখি বেহারি বাবু আসছেন কি না—এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আমরা ভাই ভগ্নি কজনে প্রাণের কাতরতায় কেবল ঘর বাহির করিতেছি এমন সময় বাবামহাশয় বেহারি বাবুকে লইয়া

আসিলেন। ডাক্তার মাকে দেখিয়াই ঘর হইতে বাহির করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমার ছোট ভাই বোনেরা সব চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যখন বাবামহাশয় ও দাদা মাকে খাট হইতে নামাইতেছিলেন তখন আমার চোখে জল নাই, ঠিক যেন মন্ত্রচালিতের ন্যায় মায়ের শয্যার এক অংশ ধরিয়া মাকে ছাদে উন্মুক্ত আকাশের তলে লইয়া শোয়াইলাম। মুখের দিকে চাহিয়া দেখি মার চক্ষু তখন অর্দ্ধ নিমিলিত, প্রাণ দেহ পরিত্যাগের জন্য ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। আমি তখন রোরুদ্যমানা ছোট ভগ্নিটিকে বলিলাম—আয় কাঁদবার অনেক সময় আছে এখন মার আত্মার কল্যাণের জন্য ঈশ্বরকে প্রাণ ভরিয়া ডাকি—এই বলিয়া করযোড়ে কাতরে মায়ের মাকে ডাকিয়া তাঁর কোলে আমার মাকে দিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি তখন মার প্রাণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া গিয়াছে,

আর শূন্য দেহ পড়িয়া আছে। তখন আকুল হইয়া আমার বুক ফাটিয়া চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, কোনমতে কম্পিত হস্তে আলতা সিঁদুর প্রভৃতি দিয়া মার মৃতদেহ সাজাইয়া দিলাম, মাকে লইয়া গেল। স্বর্ণপ্রতিমা দগ্ধ হইতে চলিল, আমি দগ্ধ হৃদয়ে গৃহে পড়িয়া রহিলাম। দুই দিন শোকে দুঃখে কাটিয়া গেল। আমাদের কাঁদিতে দেখিলে বাবামহাশয় নিষেধ করিয়া বলিতেন—কাঁদিও না, কাঁদিলে মৃত আত্মার ক্লেশ হয়।

মার মৃত্যুর পর তিন দিনের দিন রাত্রে আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম তাহা পর অধ্যায়ে স্বপ্নকাহিনীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সেইজন্য আর এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। পরদিন চতুর্থী; কন্যার কর্ত্তব্য শেষ করিলাম। পাঁচ দিনের দিন আমি একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিলাম—

পাঁচটি দিবস গত হইল জননি
দেখিনে তোমার মাতঃ চরণ দুখানি।
ক্ষণেক তোমার কাছে হইলে অন্তর
মনে করিয়াছ মাগো যুগযুগান্তর।
এখন মোদের ছাড়ি হইয়ে অন্তর
কেমনে রয়েছ মাগো বল নিরন্তর ?
কত অপরাধ মাগো করিয়াছি আমি
তাই কি মোদের ছেড়ে চলেগেলে তুমি ?
এজনমে আর কি মা করিব শ্রবন
স্নেহ মাখা তোমার সে মধুর বচন ?
আর কি কোলেতে শুয়ে জুড়াব জীবন,
আর কি দেখিতে পাব তোমার আনন ?

২

দুখেতে কাতর হলে সান্ত্বনাদায়িনী
এমন কাহারে আর পাইব জননী ?
অধম তনয়া মাগো আমি যে তোমার
কৃপাকরি অপরাধ ক্ষমিও আমার।

যতদিন রবে মাগো এদেহে জীবন
তাবৎ পূজিব মাগো তোমার চরণ।
বসাইয়া তব মূর্ত্তী মানস আসনে
ভক্তি ফুলহার দিয়া পূজিব যতনে।

মাতৃ বিয়োগে আমার বিবাহিত জীবনের আনন্দ ও সুখ অর্দ্ধেক চলিয়া গেল। তখন বুঝি-লাম যে মানব এসংসারে কখন নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করেনা। চতুর্দ্দশ বৎসরের বালিকার হর্ষোৎফুল্ল জীবনকে শোকের আঘাতে বিপ-র্য্যস্ত করিয়া দিল। এই সময় হইতে প্রায়ই আমি শোকের আঘাত পাইয়া চলিলাম, আমার শৈশব জীবনের স্মৃতিও এইখানে শেষ করিলাম। আমার জীবনের আর সব অধ্যায় অপরের কোন কাজে আসিবেনা তাহা আমাতেই রহিয়া গেল। সেই দুঃখময় অপূর্ণ কৃষ্ণ-অধ্যায় খুলিয়া কাহার নিকট ধরিব, তাই এইখানে ইতি করি-লাম।

আমার হৃদয়ের গভীর ভক্তি ও প্রণতির

সহিত স্বর্গীয় পতিদেবতার চরণে আমার রচনা ও স্বপ্ন কাহিনী উৎসর্গীকৃত হইল—

দেব !

তুমি স্বর্গে আমি মর্ত্তে, আমি ইহলোকে তুমি পরলোকে, বাহির হইতে দেখিতে গেলে তোমাতে আমাতে বহুদূরে অবস্থান করিতেছি কিন্তু আমার অন্তরের নিভৃত আসনে তুমি চির বিরাজিত, বাহিরের কোলাহল সেখানে পশেনা।

তুমি আমার আরাধ্য দেবতা ও আমি তোমার চির সেবিকা এই সম্পর্ক আমাদের কেহই ছিন্ন করিতে পারিবেনা। আমরা যখন দুইজনে ইহলোকে ছিলাম তখন কোন কথা বলিতে হইলে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ না করিলে তুমি জানিতে পারিতে না, আর এখন মনের কথা মনে না উঠিতেই তুমি তাহা জানিতে পারিতেছ। আমার ইচ্ছা ছিল আমার এই খাতা হাসিতে হাসিতে তোমার হাতে দিব কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। এখন এ খাতা

তোমার হাতে দিব সে শক্তি আমার নাই, তাই অশ্রু জলের সহিত আমার এই খাতাখানি শেষের সম্বল তোমার চরণে উপহার দিলাম। মূল্যহীন জিনিষ মূল্যবান হয় যখন তাহা ভালবাসায় উজ্জ্বল হয়।

আমার স্বপ্নকাহিনী।

(১)

আমার মাতৃবিয়োগের দুই দিনের পরের রাত্রে আমি যখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছিলাম সেই সময়ে স্বপ্ন দেখিলাম যে একজন কৃষ্ণ পরিচ্ছদে আপাদমস্তক আবৃত লোক আসিয়া আমার হাতে একখানি পত্র দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি কাগজ-খানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া তাহাতে কিছুই লেখা দেখিতে পাইলাম না, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

আমি ত এতে কিছু দেখিতে পাইলাম না, তুমি কে?

তদুত্তরে সে জলদগম্ভীর স্বরে বলিল—

তোমার মা তোমাকে ডাকিয়াছেন তাই তোমাকে জানাইতে আসিয়াছি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আমার মা কোথায়?

তাহাতে সে উত্তর করিল—

আমার সঙ্গে এস!

আমি তখন বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার অনুগমন করিলাম। ঘরের বাহির হইয়া আমার দেহে একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম, তখন বুঝিলাম সে আমাকে লইয়া শূন্যে উঠিতেছে।

অনন্ত নক্ষত্র খচিত নীলাকাশের মধ্য দিয়া আমাকে লইয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ সে ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণ করিবার ভাবে দাঁড়াইল। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড শ্বেত প্রস্তরের অট্টালিকা

ও এক সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণের রেশমি বস্ত্রের যবনিকা দেখিতে পাইলাম। সে যবনিকার মধ্যে প্রবেশ করিল, আমি দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সে অল্পক্ষণ পরে আসিয়া দুই হস্তে যবনিকা সরাইয়া দিলে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল এবং অট্টালিকার মধ্যস্থিত কক্ষ প্রকাশ পাইল। দেখিলাম তাহা মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত ও তাহার মধ্যস্থলে লাল মখমল মণ্ডিত সিংহাসন সদৃশ একখানি কৌচ। সেই কৌচের উপর আলুলায়িত কুন্তলা শুভ্রবসনা জ্যোতির্ম্ময়ী জননী দেবী—বামপার্শ্বে এক জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী উপবিষ্টা এবং দক্ষিণ পার্শ্বে আর এক তদ্রূপ রমণী দণ্ডায়মানা; উভয়ই অপরিচিতা। এই দৃশ্য আমি অবাক হইয়া দেখিতেছি এমন সময়ে মা আমায় হাসিয়া বলিলেন—

তুমি কাঁদ তাতে আমার বড় ক্লেশ হয়, দেখ আমি এখন কেমন সুখে আছি আর আমার কোন কষ্ট নাই, আগে আমি রোগে বড় কষ্ট

পাইয়াছিলাম দেখ এখন আমি কেমন শরীর পাইয়াছি। তুমি আর কাঁদিও না, তুমি কি মনে কর তুমি আমার জন্য কাঁদ? তা নয়, তুমি তোমারই জন্য কাঁদ এখন বুঝিলে ত, যাও—

মার মুখ হইতে যেই—যাও—কথাটি বাহির হইল আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

(২)

একরাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যে একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক লৌহনির্ম্মিত এক গেটের ধারে দাঁড়াইয়া আছে। সে গেটটির এমন ভীষণ আকৃতি যে তাহা দেখিলেই ভয় হয়, তাহার ভিতর দিয়া প্রবেশ ত দূরের কথা। সে গেটের লম্বা লম্বা শিকের আগাগুলি খুব ধারাল এবং তাহা এত ঘন-সন্নিবিষ্ট যে তাহার ভিতর একটা হাতও প্রবেশ করান যায় না। সেই-খানে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়াইবার পর সেই স্ত্রীলোকটি আমায় বলিল—মা, তুমি এর মধ্যে যাও।

আমি তাঁহাকে নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—আমার নাম সুখদা।

কিন্তু ভয়ে আমি কিছুতেই ভিতরে যাইতে চাহিলাম না, তিনিও ছাড়িবেন না। অবশেষে তিনি বলিলেন—দেখ উপরে কত লোক আছে, সকলেই এই পথে গিয়াছেন তুমিও যাইতে পারিবে, যাও।

তখন আমি ভয়ে ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম এবং পরে চাহিয়া দেখিলাম যে অক্লেশেই তাহা পার হইয়া আসিয়াছি। সম্মুখে দেখিলাম একটি সরল সোপানশ্রেণী, তদুপরি আর একটি স্ত্রীলোক দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। তিনি অপেক্ষাকৃত কৃশ ও আরও সুন্দরী; আমায় দেখিয়া হাসি মুখে উপরে যাইতে বলিলেন। আমি সেই সোপান অতিক্রম করিয়া যখন উপরে পৌঁছিলাম তখন তিনি সাদরে আমার হাত ধরিয়া লইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার

ভক্তি হইল, আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—আমার নাম মোক্ষদা। উপরে যাইয়া এমন একটা আলো দেখিলাম তাহার কাছে বিজলিও হার মানে, তাহা যেমন উজ্জ্বল, তেমনি স্নিগ্ধ, এক কথায় বর্ণনা হয় না। নানাজাতীয় ফুলের গন্ধ ও সুখস্পর্শ সমীরণে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি যে শয্যায় সেই শয্যায় রহিয়াছি, তখন আমার মনে হইল—

"আমি যে তিমিরে
আমি সে তিমিরে"

(৩)

আর একদিন নিশীথে স্বপ্ন দেখিলাম যে একজন লোক কৃষ্ণ পরিচ্ছদে আপাদমস্তক ঢাকিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

তুমি কে? কেন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ।

তাহাতে সে উত্তর করিল—

আমি মৃতকে লই ও জীবিতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকি, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না ?

আমি বুঝিতে না পারিয়া তাহার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। তখন সে আবার বলিল—আমায় চিনিতে পারিতেছ না ? আমি কাল !

বলিয়াই হাসিল। তাহার সে হাস্য-ধ্বনি আমার বক্ষে আসিয়া বাজিল, আমি নীরবে চলিতে লাগিলাম, সেও আমার পশ্চাতে চলিল। কিয়দ্দূর যাইয়াই জনতার কোলাহলের শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি সবিস্ময়ে চাহিতে সে আমাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া এক কৃষ্ণবর্ণের যবনিকা দেখাইল। আমি তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যবনিকার অন্তরালে কত লোক আসিতেছে যাইতেছে ! ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপ, নিম্নে এক উচ্চাসন, আসনে একজন উপবিষ্ট, তাহার আশেপাশে

কত জনসমাগম। চতুর্দ্দিক এক অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত। অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল তখন স্বপ্ন রহস্য বুঝিতে পারিলাম—মানুষের চিত্ত মোহনিদ্রায় অচেতন থাকে বলিয়াই এ বিশ্বরহস্য সুপ্তাবস্থায় বুঝিতে পারা যায়।

(৪)

আর একদিন স্বপ্নে দেখি—এক বিশাল প্রান্তরের একটি বড় বৃক্ষের ছায়ায় আমরা দুইটি প্রাণী, আমি ও একটি অপরিচিত রমণী বসিয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত আছি। এ কথা সে কথার পর সে কিছুক্ষণ চুপকরিয়া থাকিয়া আমাকে বলিল—

তুমি যাইবল আর তাই বল, ঈশ্বরকে কি জানা যায়, না বোঝা যায়? না দেখিয়া আমরা কি করে জানিতে বা বুঝিতে পারিব?

আমি বলিলাম—এই যে বৃক্ষের ছায়ায়

বসিয়া আছি ইহার শাখাপ্রশাখা সবইত দেখিতে পাইতেছ ?

তাহাতে সে বলিল—হাঁ ইহা ত আমি চখের সামনে দেখিতেছি, ইহাকে আমি কি করিয়া বলিব—নাই ?

আমি বলিলাম—ভাল, এই যে বৃহৎ বৃক্ষ রহিয়াছে ইহার মূল কি তুমি দেখিতে পাইতেছ ?

সে বলিল—না !

আমি বলিলাম—বেশ, এই গাছের যে মূল আছে তা তুমি জান ত, এবং এটাও বেশ বোঝ যে গাছ থাকিলে তাহার মূল থাকিবেই। তেমনি এই জগতের কার্য্য দেখিয়া ও নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া আমরা কারণ রূপে মূলে ঈশ্বরকে বুঝি, এই বোঝাই আমাদের ঈশ্বরকে দর্শন করা।

সে বলিল—এই গাছের গোড়া খুঁড়িলেই মূল দেখিতে পাইব, কিন্তু ঈশ্বরকে কি করিলে পাইব ?

তখন আমি বলিলাম যে তুমি কি এই গাছের গোড়া খুঁড়িয়া মূল বাহির করিবার শক্তি ধর?

তাহাতে সে বলিল—না।

আমি বলিলাম—তবে?

তাহাতে সে বলিল—যদি সে শক্তি লাভ করি তবে ত পারিব।

আমি বলিলাম—নিশ্চয়, আমি তাহা স্বীকার করি। আমরা এই জগতের তাবৎ পদার্থের মূল যদি জ্ঞানের দ্বারা খনন করিতে পারি তখন দেখি যে সকলেরই মূলে ঈশ্বর। তবে আমাদের খননের শক্তি নাই বলিয়া আমরা কেন বলিব যে ঈশ্বরকে জানা যায় না বা দেখা যায় না।

আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অবাক্ হইয়া ভাবিলাম—স্বপ্নে আমাকে এসব যুক্তি কে দিলে?—ভাবিয়া হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল!

জ্ঞান ও প্রেমের মিলন।

জ্ঞান ও প্রেম উভয়ই আমাদের মনুষ্য-জীবনে সাধনার বস্তু। প্রেম প্রথম স্তর। প্রেম মানুষকে জ্ঞানেতে পৌঁছাইয়া দেয়। প্রেম প্লাবন আনে, সেই প্লাবনে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও পাপ মলিনতা ধুইয়া হৃদয়কে পবিত্র করে ও জ্ঞানসাগরে মিশিয়া যায়। তখন আর প্রেমের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। এই জ্ঞানে ও প্রেমে যোগ সাধন করিতে হইলে আমাদের প্রথম অবলম্বনীয় প্রেম। প্রেমই আমাদিগকে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করায়। পশুতে মনুষ্যোচিত চিত্তবৃত্তি অল্প বিস্তর দেখা যায়, তবে পশুতে ও মানুষে পার্থক্য কোথায়? পশুরা লক্ষ্যশূন্য যন্ত্রচালিত ভাবে বিশ্ব-নিয়মের অধীন জন্ম মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। আর আত্মজ্ঞান লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য এবং সফলতা। মনুষ্য হইয়া যদি আত্মজ্ঞান-

লাভ করা না যায় তবে মনুষ্যতে আর পশুতে পার্থক্য থাকে না। প্রেমের মত এমন হিত-কর বন্ধু আর আমাদের কে আছে? পাপ মলিনতাকে ধুইয়া, পথের লোককে বুকে তুলিয়া লইতে, সংকীর্ণতাকে প্রসারিত করিতে, গর্ব্বিত মস্তককে সকলের কাছে নত করিতে, কেবল বিশুদ্ধ প্রেমই পারে। শক্তির ন্যায় প্রেম অপূর্ণ থাকিতে পারে না কেবলই পূর্ণ-তার দিকে চলিয়াছে। তড়িৎ যদি একটা মেঘে বেশি থাকে ও অপরে কম থাকে দুইটা মিশিয়া এক হইতে চায়—তখন বিজলী চমকিতে দেখিতে পাই। প্রেমেও সেইরূপ দুটা হৃদয়কে এক করিয়া দেয় ও সেই মিলন দেখিয়া লোকে চমকিত হয়। যেখানে প্রেমের বন্যা আসে তাহার আশে পাশে সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া চলিয়া যায়। চৈতন্যকে প্রেমের অবতার বলা হয় কারণ চৈতন্যই প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি

যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন সেই সেই স্থানের সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। পাপী পুণ্যবান সকলেই তাঁহার বক্ষে স্থান পেয়েছিল। তাঁহার গতি ছিল জ্ঞান সাগরে; তিনি তাহাতেই মিশিয়াছিলেন।

প্রেমেতে আত্মহারা করে, এই আত্মহারা ভাবই যোগের চরম উৎকর্ষতা। প্রেমের বেগ কেহই রোধিতে পারে না। মত্তমাতঙ্গসদৃশ আমাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তির সাধ্য কি প্রেমের গতিকে রোধ করিতে পারে? অন্যান্য সদ্‌বৃত্তির অনুশীলনে অল্পে অল্পে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু প্রেমে অতি শীঘ্রই পাপ মলিনতাকে ধুইয়া পুঁছিয়া লইয়া যায়। তাই প্রেমের পথ সরল। প্রেমকে বিশুদ্ধ করাই প্রেমের সাধনা প্রেমেতে যাহাতে স্বার্থপরতার খাদ না মেশে তাহাই করা উচিত; আর যদি মিশিয়া থাকে তবে তাহাকে নিবৃত্তির আগুণে গলাইয়া খাঁটি করিতে হয়। প্রেমের সাধনায়

সিদ্ধিলাভ করিলে নিঃসন্দেহ আত্মজ্ঞানলাভ করিবে ও আত্মার অন্তরতম জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরের বিমলানন্দে মগ্ন হইবে।

দয়া।

দয়া ধর্ম্মের মূল; আর নরকের মূল কি—না অভিমান। অবশ্য আমাদের ভিতর কেহই নরক নামক সুখের আলয়ে সাধ করিয়া যাইতে চাহেন, না ও চাহিবেন না। কিন্তু আমরা কত সাধে অভিমানকে হৃদয়ে স্থান দান করিয়া থাকি, আমাদের সেই অভিমানই যে নরকের মূল তাহা জানি না অথবা জানিয়াও তাহাকে পরি-ত্যাগ করিতে পারি না। অভিমান পরিত্যাগ করিবার উপায় আমাদের বিবেকবুদ্ধির দ্বারা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। অহঙ্কার হইতেই আমাদের এ পচা আমির উৎপত্তি। এই অভিমান অহঙ্কার পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন। অভিমান হইতে অহঙ্কার আর অহ-ঙ্কার হইতে আমির উৎপত্তি। এই আমার আমিত্ব এই বিশ্বসংসারে পরব্রহ্মের সত্ত্বায় হারাইতে হইবে। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহ-

মিতিমন্যতে—আমাদের কোন কর্ম্মের ক্ষমতা নাই, অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ় আত্মা আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কর্ম্মন্যে বাধিকারস্তু মা ফলেষু কদাচন—কর্ম্মে আমাদের অধিকার হউক কিন্তু ফলেতে যেন আকাঙ্ক্ষা না থাকে। ঈশ্বরের অমূল্য দান দয়া, তাহা যদি আমরা রত্ন ভাবিয়া কণ্ঠে স্থান দিই তাহা হইলে অনায়াসে আমরা ধর্ম্মকে লাভ করিব কারণ দুইটি এক সূত্রে গ্রথিত জিনিষ। এই জন্য ভক্ত তুলসী দাস গাহিয়াছেন—দয়া ধরম কি মূল হ্যায় নরক মূল অভিমান, তুলসী কহে মৎ ছোড় দয়া যাবৎ কণ্ঠাগত প্রাণ। ধর্ম্ম আমাদের স্বর্গসুখ ভোগ করায় ও আমাদের জীবন মরণের সঙ্গী হইয়া থাকে ও মৃত্যুকালে পরলোকের অচেনা পথের পথ প্রদর্শক হইয়া আমাদের পরলোকে লইয়া যায়—এই দয়া • বৃত্তিকে অনুশীলন দ্বারা আমরা

স্বর্গের দ্বারকে মুক্ত করিয়া থাকি। যে কোন সংবৃত্তিকে আমরা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিতে পারি তাহা দ্বারাই নিঃসন্দেহ জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিব।

ঈশ্বরের সত্ত্বা।

(জোড়াসাঁকোস্থ মহিলা-সভায় পঠিত প্রবন্ধ)

নিস্তব্ধতার মধ্যে আমি মহান্ অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের সত্ত্বা অনুভব করিয়া মোহিত হইয়া থাকি। যখন জীবন্ত জাগ্রত দেবতাকে অনুভব করিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে তখন "বৃক্ষইব স্তব্ধ দিবি তিষ্ঠত্যেক তেনেদম্ পূর্ণম্ পুরুষেণ সর্ব্বম্" এই ঋষিবাক্যের সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া থাকি। সজনে নির্জ্জনে পুষ্পগন্ধে বিহঙ্গমের স্বরলহরিতে তোমায় নব নব ভাবে অনুভব করি। ঘোর অমানিশায় ঘনঘটা ও মুহূর্মুহূ বজ্রাঘাত হইতেছে তাহাতে তোমার রুদ্রমহদ্ভয়ম্ বজ্রমুদ্যতম্ মূর্ত্তি বিরাজিত দেখিতে পাই। বিপদে তোমায় শান্তিদায়িনী জননীরূপে পাইয়া থাকি; সম্পদে তোমায় আনন্দময় সখারূপে পাই। অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরকে আমরা সহস্ররূপে অন্তরে বাহিরে বিরাজিত দেখি। তিনি সুখে দুঃখে

বিপদে সম্পদে আমাদের নিত্য সঙ্গী হইয়া রহিয়াছেন; তাঁহা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কাহাকে পাইব ? তিনি যেমন আমাদের বিপদ সম্পদের সঙ্গী হইয়া রহিয়াছেন সেইরূপ তিনি আমাদের জীবন মরণেরও সঙ্গী। আজ যদি আমার প্রাণ দেহ পরিত্যাগ করে তাহা হইলে এই মৃত দেহকে অনলে ফেলিয়া ভস্মসাৎ করিয়া গৃহে আসিবে, দুইদিন আমার জন্য দুইচার বিন্দু অশ্রুজল ফেলিবে ও পরে আমার স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবে, এত ভাল-বাসার এই পরিণাম, তখন কেবল অমৃতময় পরমেশ্বর তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দিবেন। ঈশ্বর ছাড়া প্রাণীর আর গতি নাই সেইজন্য আত্মদর্শী ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন "এযাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ এযোস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরমআনন্দ ! এতস্যৈবানন্দ-স্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"

হে দয়াময় তুমি আমাদের পাপতাপ

শোকদুঃখপূর্ণ সংসারে একমাত্র গতি এই বিপদরূপ সংসারসমুদ্রে তুমি আমাদের ধ্রুব-তারা এই সংসারসাগরে তোমার চরণ-তরি আমাদের একমাত্র; আশ্রয় আমরা যেন বিপদে সম্পদে সুখে দুঃখে তোমাকে না হারাই এই তোমার চরণে প্রার্থনা।

ওঁ শান্তি! শান্তি!!

ধর্ম্ম।

আমাদের জ্ঞান নাই বলিয়া কি ধর্ম্মকেও পরিত্যাগ করিব? না, কখনই না! আসুক না শত সহস্র বিপদ্, তাহা অক্লেশে অতিক্রম করিয়া যাইব। ধর্ম্মরূপ পর্ব্বতের গুহায় যে আশ্রয় লইয়াছে বাহিরের ভীষণ ঝটিকা তাহার কিছুই করিতে পারে না। আইস ভগ্নিগণ, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি। তিনি আমাদিগকে পাপের হাত হইতে রক্ষা করিয়া অমৃতময় পরমেশ্বরের ক্রোড়ে লইয়া যাইবেন। আমরা সকলেই এক পরলোকের যাত্রী। এলোকে আমাদিগকে কোথাও যাইতে হইলে যেমন পাথেয় সংগ্রহ করিয়া তবে পথ চলিতে হয় সেইরূপ আমাদিগকে পরলোকের জন্য ধর্ম্ম-ধন সঞ্চয় করিতে হইবে। আমরা যদি প্রতিদিন একটি করিয়া পয়সা রাখি তবে এক বৎসরে ৫৷৷৶৫ হইয়া

থাকে ; আমাদের যতদিন জীবন আছে ততদিন যদি অল্প অল্প করিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় করি তবে কি মৃত্যুকালেও ৫৷৷৶৫ হইবে না ? নিস্বম্বল যাওয়া অপেক্ষা তাহা কি ভাল নয় ? আমার কিছু হইল না বলিয়া হাতের লক্ষী পায়ে ঠেলার ন্যায় করিলে আর কি হইবে ? আশায় বুক বাঁধিতে হইবে। ঈশ্বর ধর্ম্মরূপ হস্ত বাড়াইয়া পাপী তাপীকে ডাকিতেছেন, আমরা যদি মার হাত ধরি, মার ডাক্ শুনি তবে নির্ভয়ে এ দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে পারিব, সংসারের কোলাহল হইতে একটু নির্জ্জনে যাইলে মার ডাক্ আরও স্পষ্ট শুনিতে পাইব, আজ হইতে আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে আমরা ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিব না ও ধর্ম্মের আশ্রয় লইব। ঈশ্বর আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি দিন তিনি আত্মাতে শান্তি, মনে আনন্দ, ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল প্রদান করিতেছেন তাঁহার অপার দয়া ও করুণা

স্মরণ করিয়া আমরা যেন প্রতিদিন তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাই; ধর্ম্মকে আমরা রক্ষা করি ধর্ম্ম আমাদের রক্ষা করুন।

হে পরমাত্মন্! এই বিশাল জগতে অগণ্য গ্রহনক্ষত্র সকল নিয়ত ভ্রাম্যমান হইতেছে। সকলেই তোমার নিয়ম-রজ্জুতে বদ্ধ রহিয়াছে। কি জড় পদার্থ কি সচেতন পদার্থ সকলেই তোমার অধীন ও তোমার নিয়মে চালিত, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিতে পারে না। দেব! ধন্য তোমার রচনার কৌশল! ক্ষুদ্র জীব আমি, তোমার সৃষ্টির রহস্য কি বুঝিব, তোমাকেই বা কি করিয়া ধারণা করিব? তোমাকে জানিবার ক্ষমতা আমার নাই। বাক্য তোমায় বলিতে গিয়া পরাস্ত হয়, মন তোমায় মনন করিতে গিয়া নিবৃত্ত হয়। একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই তোমাকে জানা যায়। কিন্তু আমার সে জ্ঞান কোথায়? দয়াময়! তোমায় জানিনা, কিন্তু ক্ষুদ্র হৃদয়ে তোমায় পাইবার আশাটুকু সযত্নে পোষণ

করিতেছি; এই আশাই আমাকে জীবিত রাখিয়াছে। আমি সতত ভয়ে ভয়ে সারা হই পাছে আমার এই আশালতার মূলচ্ছেদন করিয়া ফেলি। আকিঞ্চন-সলিল সেচন করি পাছে শুষ্ক হইয়া যায়। আমার আর কি আছে? এই আশাকেই বক্ষে ধারণ করিয়া কত সন্তর্পণে জীবন-সংগ্রামে চলিতেছি। যখন জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত হইয়া পড়ি তখনই আশা আমাকে বলিয়া ওঠে—চল তিনি পাপীর বন্ধু, তুমি তাঁহাকে পাইবে। তখন আমার প্রাণে বল আসে। আশামাত্রেই কি সবশেষ হইবে? না অবশেষে তোমায় সত্য সত্যই পাইব? দয়াময়! কি বলিয়া তোমায় সম্বোধন করিলে আমার হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিবে তাহা আমি জানিনা, এমন ভাষা খুঁজিয়া পাই না। দয়াময়! আমি মূর্খ, আমার বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, আমি শুনিয়াছি তোমায় উপলব্ধি করিবার জন্য বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না, তুমি কেবল মনুষ্যের

ব্যাকুলতা দেখ। আমার হৃদয়কে তোমার জন্য ক্রন্দন করিতে শিখাও, আমার পাপ-কালীমা তোমার প্রেমনীরে বিধৌত করিয়া লও, আমার উপর তোমার করুণা বর্ষিত হউক। তুমি আমাদের আত্মার কল্যাণ বিধান কর, তুমি আমাদের হৃদয়ে প্রেমেররাজ্য স্থাপন কর, জগতে শান্তি স্থাপন কর, জগতে শান্তি স্থাপিত হউক, এই তোমার চরণে প্রার্থনা করি।

ওঁ শান্তি! শান্তি!

স্বার্থপরতা।

আমরা স্বার্থপরতার গণ্ডি দিয়া একটি ক্ষুদ্র সংসার করিয়া আমাদের বিশ্ব-জননীর রাজ্যে বাস করিতেছি। এই স্বার্থপরতার মূলে অহঙ্কার—আমাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে এই সঙ্কীর্ণতা আসিয়াছে। আমার পুত্র আমার কন্যা আমার ধন ইত্যাদি করিয়া স্বার্থপরতা এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহা আমরা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারি না। সহজে পারি না বলিয়াই যদ্যপি মনের হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকি তাহা হইলে স্বার্থপরতার অতল সলিলে আমাদিগকে নিমজ্জিত হইতে হইবে। আমাদের কোন কর্ম্মের ক্ষমতা নাই অথচ "আমি করিতেছি" এই মনের ভাবই কর্ম্ম-ফলরূপী পাপ পুণ্যের বোঝা আমাদের স্কন্ধে চাপাইতেছে আমরা সকলে সেই বিশ্ব-জননীর সন্তান, সমস্ত নরনারী আমাদের ভ্রাতা ও ভগিনী, তাহা আমরা জানিয়া শুনিয়াও

তাহাদিগকে আপনার করিতে পারি না তাহার কারণ প্রেমের অভাব। সদ্ভাবের স্থান স্বার্থ-পরতা আসিয়া অধিকার করিয়াছে ও আমা-দিগকে আপনার-পর, ধনী-দরিদ্র প্রভৃতি করিয়া পৃথক্ করিয়া দিতেছে। প্রেমের কাছে সব সমান। প্রেম বলে পাপকে ঘৃণা করিবে পাপীকে ঘৃণা করিবে না। প্রেমের বলে বলীয়ান হইয়া নিতাই জগাই মাধাইকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিয়া প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া হরিনাম দিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। স্বার্থপরতা আমাদের মনুষ্যত্ব হরণ করিয়াছে, এখন আমরা এই আমিত্বটুকু লইয়া এই বিশাল জগতের একপ্রান্তে পড়িয়া আছি। আমরা যে সকলে মিলিয়া সেই বিশ্ব-জননীকে ডাকিতেছি ও পর-স্পরের মধ্যে মনোভাব আদান প্রদান করিতেছি ইহা কি কম সৌভাগ্যের বিষয়? যাঁহার হৃদয় দিয়া ঈশ্বর এই শুভ ইচ্ছা প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ দিই।

প্রেমময়! তুমি আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা দূর কর। স্বার্থপরতার কুটিল পাপ আমাদের মনুষ্যত্ব হরণ করিয়াছে। স্বার্থপরতার অতল জলে নিমজ্জিত হইতেছি। প্রেমময়! তোমার রাজ্যে বাস করিয়া কেন এত সঙ্কীর্ণতা লইয়া আছি? তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহারার মরুভূমিতে অমৃতের প্রস্রবণ হউক। যেন সকলকেই আপনার করিতে পারি সে শক্তি আমাদিগকে দেও, অহঙ্কার রাগ দ্বেষ পাপ কুটিলতা আমাদের হৃদয় হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করুক। তোমার দয়া আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হউক, প্রেমের বন্যায় স্বার্থ-পরতার পাপ তাপ দুঃখ দরিদ্রতা ভাসিয়া যাউক।

ভ্রমণ-কাহিনী।

৬ই মাঘ রাত্রি ৭ঘটিকার সময় রেল পথে বালিগঞ্জ ষ্টেশন হইতে আশা ও ভরসাশূন্য হৃদয় লইয়া শিশুপুত্র কন্যাদের রাখিয়া রজনীর অন্ধকারে ভ্রমণে বাহির হইলাম। কোথায় যাইব, কি করিব, কিছুই স্থির করিয়া বাড়ীর বাহির হই নাই। তবে ২০ দিনের মধ্যে বাড়ী ফিরিব একথা বাড়ীতে বলিয়া ও যৎসামান্য কাপড় ও তুইখানি পুস্তক লইয়া বালীগঞ্জে রেলে উঠিয়া সেখান হইতে বেলেঘাটা হইয়া গাড়ী করিয়া হাবড়ার ষ্টেশনে পোঁছিলাম। আমার প্রধান তীর্থ মধুপুরে সর্ব্বপ্রথম যাইব এই মনস্থ করিয়া রেলে উঠিলাম। সঙ্গে আমার খুল্লতাত-পুত্র ছিলেন। আমি মেয়েদের গাড়ীতে, আমার ভাই অন্য গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছি, কিছুক্ষণ পরে দেখি একটি মেয়ে উঠিল। ভাবিলাম নিঃসঙ্গ যাওয়া অপেক্ষা একটি সঙ্গী জুটিল ভালই

হইল। তাহার পরিচয় জানিলাম, তাহার স্বামী ধানবাদে কাজ করে, সেও সেইখানে যাই-তেছে, রাজ-দরশনে আসিয়াছিল। তাহার ঘরের কথা ও সুখ দুঃখের কথা শুনিতে শুনিতে ১১টা বাজিয়া গেল। আসিবার সময় আমার কন্যা অনেক করিয়া বলিয়া দিয়াছিল তাই একখানি লেপও সঙ্গে লইয়াছিলাম। ১১টা বাজিবার পর শুইবার জন্য রেলের জানলার সার্সিগুলি বন্ধ করিতে গেলাম; তাহার একখানি বন্ধ হইল না, হূ হূ করিয়া হাওয়া আসিতে লাগিল। সে মেয়েটির স্বামী আসিয়াও অনেক চেষ্টা করিয়া উঠাইতে পারিলেন না, কাজেই আমরা তদবস্থায় শুইয়া পড়িলাম। দেখিলাম সে মেয়েটি শীতে কাঁপিতেছে; আমার লেপখানি তাহাকে দিয়া আমার দেহস্থিত বালাপোষে গা ঢাকিয়া শুইয়া পড়িলাম। আশা ও ভরসাশূন্য হৃদয়ে আর কিছু থাক আর না থাক্ স্বস্তি টুকু ছিল তাই শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন

আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন গাড়ী একটা ষ্টেশনে আসিয়াছে।

উঠিয়া বসিয়া দেখিলাম সেটা আসানসোল ষ্টেশন, তখন ভোর হয় হয়, শুখতারা উঠিয়াছে। আসানসোল ষ্টেশনটি আমার কাছে ভাল লাগিবার কারণ আমি তথায় ৩।৪ বৎসর ছিলাম। সেখানকার পুরাতন স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়াছিল সে স্মৃতি আমার হৃদয়ে বেশীক্ষণ রহিল না কারণ আমার আসা ভরসাশূন্য হৃদয় সুখ দুঃখের অতীত পথ খুঁজিতেছিল; সেই যে উঠিলাম আর শুইলাম না, মুড়ি শুড়ি দিয়া বসিয়া দেখিতে দেখিতে চলিলাম, রজনীর ঘোর অন্ধকার ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ঊষার অঞ্চলে মুখ লুকাইল, হাসিতে হাসিতে ঊষারাণী পূর্ব্বাকাশে দেখা দিলেন। শীতকালের ঠাণ্ডা হাওয়া ততটা প্রীতিকর বোধ হইতেছিল না তথাপি আমি সেই ভাবেই বসিয়া রহিলাম। কোনো একটা ষ্টেশনে সঙ্গীটি নামিয়া গেল।

আমি একাকী মধুপুরের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম, তার পরে গাড়ী মধুপুরে আসিয়া থামিল। এই মধুপুরে আমার স্বামী দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, এই মধুপুরে কার্ত্তিক মাসের ১৬ই আসিয়াছিলাম। সেই এক আসা আর এই এক আসা। তখনকার আসা ছিল স্বামীর আরোগ্য কামনায়, আর এখন আসা তীর্থদর্শন, ষ্টেশনে একটি গাড়ী করিয়া Tagore cut-এ আমার মাতুল মহাশয় থাকেন, সর্ব্বাগ্রে সেইখানে যাইলাম সেইখানে যাইয়া সেখান হইতে কিছু পুষ্প চয়ন করিয়া লইয়া Tagore Cut এর ম্যানেজার জানকী বাবুর বাড়ীতে গিয়া সেইখানে মুখ হাত ধুইয়া আমরা যে বাঙ্গালায় পূর্ব্বে ছিলাম সেইখানে গেলাম। সে বাংলাটি তখন বন্ধ ছিল আমি তাহার সম্মুখস্থ বারান্দায় বসিলাম; আমার ভাই তাহার চাবি আনিতে গেল—মনে হইল শনিবারে এই বাংলায় উনি দেহত্যাগ করেন আর আজও

শনিবার। ইতিমধ্যে চাবি আসিল, ঘরের মধ্যে যাইয়া দেখিলাম যেখানে যেমনটি ছিল সেই-রূপই রহিয়াছে। ঘরের মধ্যে যাইয়া আমার অতীত কালের ঘটনা সকল কে যেন আমার চক্ষের সম্মুখে ধরিল, আমি সেইখানে বসিয়া আমার দৈনন্দিন উপাসনা ও পূজা শেষ করিলাম। আমার মাতুল মহাশয় আমাদের জন্য চা পাঠাইয়াছিলেন তাহা পান করিয়া আমার স্বামীর এক শ্রদ্ধেয় বন্ধুর পুত্র—এক সময় তিনি আমাদের অনেক উপকার করায় তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞতার ঋণী ছিলাম—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে মধুপুর হইতে কিছু দূরে অবস্থিত তাঁহার বাড়ীর দিকে গাড়ী করিয়া রওনা হইলাম। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া পুনরায় Tagore Cot এ আসিয়া আমরা গাড়ী ছাড়িয়া দিলাম। রেলে বসিয়া সংকল্প করিয়াছিলাম বৈদ্যনাথ হইয়া অন্যত্র যাইব। তার পরে আমরা Cot-এর সুযোগ্য

ম্যানেজার জানকী বাবুর বাড়ীতে গেলাম। সেখানে যাইয়া আমার দুই আত্মীয়ার সহিত বহুদিন অসাক্ষাতের পর সাক্ষাৎ হইল—তাহাদেরও জীবনে আমার মত দুঃখের ঝড় অনেক বহিয়া গিয়াছে তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে অনেকটা আনন্দ বোধ করিলাম। তার পর বেলা তিনটার সময় আত্মীয়া দুইটি ও আমরা সকলে মধুপুর হইতে রওনা হই-লাম। তাঁহারা শিমুলতলা হইতে আসিয়াছিলেন সেইখানে যাইবেন, আর আমি বৈদ্যনাথে যাইব। অল্পক্ষণ পরে আমাদের গাড়ী বৈদ্যনাথ ষ্টেশনে দাঁড়াইল, আমরা নামিয়া ট্রামের মত একটি ছোট রেলগাড়ীতে উঠিলাম। দেওঘর ষ্টেশনে নামিয়া পথপ্রদর্শকরূপে একজন বৈদ্যনাথের পাণ্ডা একখানি ঘোড়ার গাড়ী আনিয়া তাহাতে আমাদের চড়াইয়া তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল। যাইয়া বলিল মা আপনারা কি আজ রাত্রে থাকিবেন? শয়নের ব্যবস্থা

করিয়া দিব ? আমরা বলিলাম, না আমরা ঠাকুর দেখিয়া আজই রওনা হইব। পাণ্ডা বলিল, আচ্ছা মা আপনার যা অভিরুচি হয় সেইরূপই ব্যবস্থা করিয়া দিব। এই কথা বলিয়া বসিবার জন্য একখানি সতরঞ্চি পাতিয়া দিয়া তাহার চাকরকে মুখ হাত ধুইবার জল আনিতে বলিল—আমি সমস্ত দিন অনাহারে শ্রান্ত হইয়াছিলাম, পাণ্ডা নিজে যাইয়া আমার জন্য কিছু রাবড়ী ও মালাই ও আমার ভ্রাতার জন্য লুচি ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিল। তার পর আমরা জলযোগ করিয়া ঠাকুর দর্শন করিতে গেলাম। পাণ্ডার বাড়ীর অনতিদূরেই মন্দির, পাণ্ডা আমাদের সঙ্গে চলিল, আমরা পদব্রজেই চলিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার, পথে তেমন আলোর বন্দোবস্ত নাই, আর পথের দুই ধার হইতে কেবল শিবারা সন্ধ্যা ঘোষণা করিতেছে। আমি পাণ্ডাকে বলিলাম যে বৈদ্যনাথে বড় বেশি শেয়াল আছে দেখছি, তাহাতে পাণ্ডা বলিল,

যে সারাদিন উহারা থাকে না, সন্ধ্যা হইলে দল বাঁধিয়া বন হইতে আসে আবার প্রভাত হইলেই চলিয়া যায়।

ইতিমধ্যে ঠাকুরবাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গনে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার চারিদিকেই মন্দির, সম্মুখে হর পার্ব্বতীর মন্দীর, ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া দেখিলাম লালবস্ত্র খণ্ডের দ্বারা মহা-দেবের মন্দির হইতে পার্ব্বতীর মন্দিরে গ্রন্থি বন্ধন করা আছে। আমি তাহা দেখিয়া পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহার উদ্দেশ্য কি? পাণ্ডা বলিল যে, যাত্রীগণ শুভ-ফলাকাঙ্খায় টাকা খরচ করিয়া এই গ্রন্থি বাঁধিয়া যায়। সেই গ্রন্থি বন্ধন দেখিয়া আমার মনে হইল যে আমার স্বামীর হৃদয়ে ও আমার হৃদয়ে যে গ্রন্থি বন্ধন হইয়াছিল তাহা ইহ-লোক পরলোকের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। প্রেমের পরাকাষ্ঠা হর পার্ব্বতীর যুগল মুর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে

প্রেমের মহাসত্তায় মগ্ন হইয়া গেলাম। আমায় তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া পশ্চাৎ হইতে পাণ্ডা ডাকিল—মা, ঠাকুর দর্শনে চলুন—তখন আমার চমক ভাঙ্গিল। অগ্রসর হইয়া দেখিলাম দুই তিন জন সন্ন্যাসী মন্দিরের প্রশস্ত বারান্দায় বসিয়া দর্শকের কোলাহলশূন্য নিস্তব্ধ রাত্রে মৃদুস্বরে ভজন গান করিতেছে, সেখানে শান্তি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে। মন্দিরের ভিতর যাইয়া দেখি তখন আরতির আয়োজন হইতেছে, মহাদেবের মাথায় চন্দন দিয়া একরাশ ফুল চাপান হইয়াছে, মহাদেবের সেই এক বেশ। মহাদেবের ও পার্ব্বতীর মন্দির দেখিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আবার সেই পাণ্ডার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

পাণ্ডা বলিল—আপনাদের যাইবার গাড়ী রাত্র ১টায়, এখান হইতে রাত্র ১২টায় যাইলেই হইবে। আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম

করুন আমরা ঠিক সময়ে গাড়ী আনিয়া আপ-নাদের লইয়া যাইব।—এই কথা বলিয়া তাহারা সকলে বহির্ব্বাটিতে চলিয়া গেল। একটি কেরোসিন তৈলের ল্যাম্প মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। আমি আমার ভ্রাতাকে বলি-লাম যে, দুই জনে ঘুমাইলে চলিবে না সঙ্গে টাকা কড়ি আছে, রাত্রকাল অপ-রিচিত স্থান, একজনকে শুইতে হইবে এক-জনকে জাগিতে হইবে। আমার ভাই বলিল—আমি জাগিয়া আছি তুমি শোও। আমি বিনা উপাধানে আমার গাত্র বস্ত্রই গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ভাইকে বলিলাম—এইবার গাড়ী আনিবার ব্যবস্থা দেখ, শুধু পরের কথায় নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। এই বলিতে বলিতে পাণ্ডা আসিয়া বলিল—মা গাড়ী এসেছে।

আমরা গাড়ীতে উঠিয়া কাশি রওনা হই-

লাম এবং পর দিন বেলা এগারটার সময় কাশিতে পৌঁছিলাম। পৌঁছিয়াই গঙ্গাস্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শনের পর বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, এবং সেই দিনই বৈকালে সেখান হইতে আমার কন্যাকে দেখিবার জন্য লক্ষ্ণৌ রওনা হইয়া ভোর ৫ টার সময় লক্ষ্ণৌয়ে পৌঁছিলাম। আমরা ষ্টেসন হইতে গাড়ী করিয়া তখনই বাহির হইলাম এবং বাড়ীতে উঠিয়া দেখি সকলেই নিদ্রিত। অনেক ডাকা-ডাকি করায় সকলে উঠিয়া আসিল এবং অসময়ে আমায় উপস্থিত দেখিয়া আমার কন্যা বিস্মিত হইল। কন্যার বিশেষ অনুরোধে সেদিন সেখানে থাকিয়া পরদিন ৩টার গাড়ীতে উঠিয়া ডেরাডুন রওনা হইলাম। আমি মেয়েদের একটি খালি গাড়ীতে উঠিলাম, আমার ভাই অন্য গাড়িতে উঠিল। গাড়ী চলিতে লাগিল, আমি একাকী প্রকৃতির দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইবার পর অন্ধকারে

আর কিছু দেখা না যাওয়ায় আমি বেঞ্চেতে শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি ১টার সময় গাড়ীর দরজা খোলার শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল চাহিয়া দেখি দুইটা কুলি কতকগুলি জিনিষপত্র লইয়া গাড়ীতে ঢুকিল। কুলিরা জিনিষপত্রগুলি রাখিয়া নামিয়া যাবার পর একটি বর্ষিয়সী ইংরাজ-রমণী গাড়ীতে আসিলেন। কুলি একটা টুক্‌রি বেঞ্চিতে রাখিয়াছিল, অন্যান্য জিনিষপত্র এধার ওধার সাজান ছিল, সেই ইংরাজ-রমণী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—এই টুক্‌রি তোমার? আমি বলিলাম—না। অল্পক্ষণ পরেই আর একটি যুবতী ও সুন্দরী ইংরাজমহিলা একটি বন্দুক লইয়া গাড়ীতে উঠিল এবং হস্তস্থিত বন্দূক রাখিয়া বেঞ্চে বসিল। পরে তাহাদের সহিত পরিচয়ে জানিলাম তাহারা সৈনিকরমণী, শিকার করিতে গিয়াছিল, এক্ষণে বাড়ী ফিরিতেছে। আমার সহিত রমণীদ্বয়ের খুব ভাব

হইয়া গেল, তাহারা তাহাদের দেরাডুনের বাংলায় আমাকে যাইবার জন্য বিশেষ অনু-রোধ করিল ও তাহাদের নাম ধাম আমার পকেট-বহিতে লিখিয়া দিল এবং বলিল তুমি যখন মসূরি বেড়াতে যাবে তখন আমি এক-খানা চিঠি দেব সেখানে আমার চৌকিদার আছে সে তোমাদের আবশ্যকমত সাহায্য করিতে পারিবে। এই দুইজন সঙ্গী পাইয়া পরস্পর গল্প করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হয় হয় এমন সময় দেরাডুন ষ্টেসন উপস্থিত হওয়ায় আমরা সকলেই গাড়ী হইতে নামি-লাম। ইংরাজরমণীদ্বয় আপন গৃহাভিমুখে চলিল, আমি ও আমার ভ্রাতা ৺ কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাংলা অভিমুখে রওনা হইলাম। আমরা বাংলার দ্বারে অনেক ডাকাডাকি করিলাম কেহই উঠিল না, সকলেই তখনও নিদ্রিত, তাই বৃথা সেখানে সময় নষ্ট না করিয়া আমরা গাড়ো-য়ানকে টপকেশ্বর যাইতে বলিলাম। "আমাদের

গাড়ী টপকেশ্বরের পথে চলিল। দুই ধারে জঙ্গল, রাস্তাটা পাহাড়ে।

বিলক্ষণ শীত। দেখা গেল কোচম্যান টপ-কেশ্বরের ঠিক পথ জানে না গাড়ী জঙ্গলের মধ্য দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এমন এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল যে, আর সেখানে গাড়ী চলে না। তখন কোচম্যান তাহার সঙ্গের একটা ছোঁড়াকে নামাইয়া দিল, সে ছেলেটা ঘোড়ার মুখ ধরিয়া টানাটানি করিতে নিজেই মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন আমি ভাইকে বলিলাম—তুমি গাড়ী থেকে নাম, দেখিতেছ না কোচম্যান পথ জানে না, এখানকার অন্য কোন লোককে পথ জিজ্ঞাসা কর। আমার ভাই নামিয়া সম্মুখে একজন হিন্দুস্থানী পথিককে দেখিয়া তাহাকে পথ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে আমরা পথ ছাড়িয়া বিপরীত দিকে আসিয়াছি। তাহাকে পথ দেখাইয়া দিতে বলায় সে আমাদের

সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। তখন কোচম্যান নিজে অনেক কষ্টে টানাটানি করিয়া গাড়ীখানি বাহির করিল ও পথপ্রদর্শক পথিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিয়দ্দূর যাইয়া এক জায়গায় গাড়ী দাঁড় করাইয়া বলিল যে আপনারা এইখানে নামুন আর আগে গাড়ী যাবে না। কাজেই আমরা নামিয়া টপকেশ্বর দেখিতে পদব্রজেই চলিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখি যে পর্ব্বতের একটি গুহায় টপকেশ্বর নামে এক মহাদেব প্রতিষ্ঠিত, ঊর্দ্ধদিক হইতে পাহাড়ের জল টপ্ টপ্ করিয়া শিবের মাথায় পড়িতেছে, সম্ভবতঃ এই জন্যই টপকেশ্বর নাম হইয়াছে। প্রবাদ আছে পূর্ব্বে জলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ ক্ষরিত হইত, পরে কোন রাখাল বালক তাহা উচ্ছিষ্ট করায় দুগ্ধের বদলে জল পড়িতেছে। এই গুহার সম্মুখে একটি বৃক্ষের গোড়া ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর বাঁধাইয়া দিয়াছেন সেখানে একজন

সন্ন্যাসী বাস করিতেছেন। আমরা টপকেশ্বর দেখিয়া কালীকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম এবং সেখানে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া টোঙ্গায় করিয়া রাজপুর রওন হই-লাম। রাজপুরে পৌঁছিয়া একটি ডাণ্ডি ভাড়া করিয়া মসূরী রওনা হইলাম কিন্তু আমার ভাই ডাণ্ডি বা ঘোড়ায় চড়িতে সম্মত না হইয়া বলিল—না, আমি পদব্রজে তোমার সঙ্গে যাইব। আমরা পাহাড়ের যতই ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ততই মুগ্ধ হইলাম। ইংরাজরা সুন্দর রাস্তা ও বাড়ী ঘর করায় পাহাড় এখন নগরীর রূপ ধারণ করিয়াছে। ছোট খাট অনেক বাজার আছে, তন্মধ্যে ল্যাণ্ডোর বাজারই দর্শন যোগ্য—ডাণ্ডিওয়ালা আমাকে লইয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকিল কিন্তু আমার ভাই পদব্রজে পাহাড়ে উঠায় অনভ্যস্ত তাই অনেক পিছাইয়া পড়িল, কাজেই আমি একাকী পাহা-

ড়ের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। দেখিলাম—পর্ব্বতবাসীরা পৃষ্ঠদেশে নানাবিধ মোট, আলু চাল ডাল ইত্যাদি, এমন কি বড় বড় আলমারি পর্য্যন্ত, লইয়া অনায়াসে চলিয়াছে এবং মহাজনেরা ঘোড়ার পিঠে দিয়া নানাবিধ পণ্য দ্রব্য ল্যাণ্ডোর বাজারে লইয়া যাইতেছে! কিয়ৎক্ষণ পরে বালুর বাজারে ডাণ্ডিওলারা ডাণ্ডি নামাইয়া আমার নিকটে জলখাবার পয়সা চাহিল এবং জলপান করিয়া সুস্থ হইল।

তাহারা আবার ডাণ্ডি তুলিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় আমার ভাই আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্বোল্লিখিত মেম আমাকে একখানি পত্র দিয়াছিল এবং বলিয়াছিল যে এই বালুর বাজারে তাহার একখানি বাংলা আছে। আমার ভাইকে শ্রান্ত দেখিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে বলিয়া আমি ল্যাণ্ডোর বাজার দেখিয়া আসিয়া এক ঘোড়া করিয়া

আমার ভাইকে সঙ্গে লইয়া যখন রাজপুরে ফিরিয়া আসিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। শুনিলাম রাজপুরে সন্ সন্ ধারা নামে একটি পাহাড় আছে, নামটি বোধ হইল যেন সহস্র ধারার অপভ্রংশ। তাহা দেখিব বলিয়া সেরাত্র রাজপুরের বাসায় রহিলাম এবং পরদিন প্রাতে ৯ টার সময় ডাণ্ডি ভাড়া করিয়া রওনা হইলাম। কিয়ৎ দূর যাইয়া ঝরণার ঝর্ ঝর্ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল, আমি ভাবিলাম এই বুঝি সহস্র ধারার শব্দ।

কিন্তু ডাণ্ডিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল এ অন্য একটা ঝরণার শব্দ। পথ এত দুর্গম যে প্রতি পদেই পদস্খলনের সম্ভাবনা, সেখানে ডাণ্ডি ভিন্ন ঘোড়ায় যাওয়া যায় না, পণ্য দ্রব্য ও অন্যান্য মাল একপ্রকার শ্বেত ছাগল ও মেষের পৃষ্ঠে দিয়া লইয়া যায়। এইরূপ একদল গলায় ঘণ্টা বাঁধা ছাগল পিঠে বাজারের পণ্য দ্রব্য ও পশ্চাতে

পাহাড়ী চালক লইয়া আসিতেছে তাহা দেখিতে দেখিতে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া দেখি কোথাও ঝর্ ঝর্ কোথাও বা ঝুর ঝুর করিয়া নিশিদিন জল ঝরিতেছে। অনতিদূরে এক সমতল ভূমিতে দেখিলাম গন্ধকের প্রস্রবণ অনবরত গন্ধক-মিশ্রিত ঈষৎ উষ্ণ জল উদ্গীরণ করিতেছে, সেই জলে রজতখণ্ড ফেলিয়া দিলেই তাহা তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এই জল বড় হজমি ও চুলকণাদি নাশক, আমরা শুনিয়াছিলাম ১ টাকা মূল্যে ১ বোতল জল গভর্ণমেণ্টের লোক বিক্রয় করে কিন্তু আমরা যখন সকালবেলা গিয়াছিলাম তখন কোন প্রহরী ছিল না কাজেই আমরা তাহা বিনা মূল্যেই সংগ্রহ করিয়া আনিলাম।

আমরা রাজপুরে ফিরিয়া আসিয়া হরিদ্বারে রওনা হইলাম সেই দিনই বেলা ৪টার সময় হরিদ্বারে পৌঁছিলাম। সেখানে একটি

ধৰ্ম্মশালায় উঠিয়া গাড়ী করিয়া কঙ্খল দেখিতে রওনা হইলাম। কিছুদিন পূর্ব্বে একবার হরিদ্বারে আসিয়াছিলাম বলিয়া সেখানকার কিছু পুনরায় না দেখিয়া বরাবর কঙ্খলেই যাইলাম। কঙ্খলে যখন পৌঁছিলাম তখন অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের লোহিত কিরণ গঙ্গার স্বচ্ছ সলিলে পড়িয়া বড়ই রমণীয় হইয়াছিল। এইখান হইতে তরঙ্গিণী পর্ব্বতেমালার মেখলা পরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া সাগর অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। এইখানে দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। মহাদেবের প্রস্তর মূর্ত্তি ও দক্ষযজ্ঞনাশের সমস্ত দৃশ্য রহিয়াছে অর্থাৎ বীরভদ্র প্রভৃতির প্রস্তর দেহ রহিয়াছে। ঐখানে রাত্রে থাকিয়া পরদিন গাড়ী করিয়া হৃষীকেশে রওনা হইলাম। সকাল বেলায় হৃষীকেশে যাইয়া সেখানকার একটি ধৰ্ম্মশালায় উঠিলাম। এখানকার ধৰ্ম্মশালার সুন্দর বন্দোবস্ত, একটি বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা চারিদিকের চকমিলান দালান এবং যাত্রীদের

পরিচর্য্যার জন্য ৪ জন চাকর যাত্রীদের খাইবার শুইবার আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্য গুদামে রহিয়াছে। চাকরেরা আমাদের স্নানের জল ও অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য সররবাহ করিল, এমন কি আমরা আসিবার সময় কিছু পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলাম তাহারা বিনীত ভাবে তাহা লইতে অস্বীকার করিল। আমরা সেখান হইতে ডাণ্ডি করিয়া লছ্‌মনঝোলা দেখিতে রওনা হইলাম। আমরা এক ছোট পাহাড়ের ভিতর দিয়া বদ্রিনারায়ণ যাইবার পথে চলিলাম।

লছমনঝোলায় যাইয়া একটি কাঠের সেতু এবং রাম ও লক্ষণ প্রভৃতির কতিপয় মন্দির দেখিয়া হৃষীকেশের ধর্ম্মশালায় আসিয়া তথা হইতে গাড়ী করিয়া ৮টার সময় ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। ট্রেণ রাত্রি ১টায় ছাড়িবে কাজেই আমাদের সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল। ট্রেণ আসিলে আমরা রওনা হইলাম এবং

প্রাতঃকালে দিল্লীতে পৌঁছিলাম। সেখানে একটি লোক আসিয়া আমাদের বলিল—এখানে ব্রাহ্মণের ভাল হোটেল আছে চলুন সেই-খানে বাসা করিবেন—এই বলিয়া আমাদিগকে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া তথায় লইয়া গেল। হোটেল বাড়ীটি ত্রিতল, আমরা ত্রিতলের একখানি ঘর থাকিবার জন্য পাইলাম। ঘরের ভিতর যাইয়া দেখি একখানি ক্যাম্প খাট ও একখানি চৌকি রহিয়াছে এবং ভূমিতে একখানি সতরঞ্চি পাতা। প্রতিদিন ১ টাকা করিয়া ভাড়া দিতে হইবে। আহারের জন্য একবেলা খাইলে পাঁচ আনা, আর দুই বেলা খাইলে আট আনা, প্রাতে দুই তিন রকম নিরামিষ তরকারী দুই রকম ডাউল এবং বৈকালে তরকারী ভাত ও রুটি এবং একখানি করিয়া পাপরপোড়া। পোড়া পাপর দেখিয়া তাহাই আমার দিল্লীর লাড্ডু বলিয়া মনে হইয়াছিল। আমার ভাই

ও আমি উভয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া একখানি গাড়ী করিয়া দিল্লীর সহরে যেখানে দরবার হইয়াছিল তাহা দেখিয়া সে দিন ফিরিয়া বাসায় আসিলাম। পরদিন আবার গাড়ী করিয়া হোটেলওয়ালার সমস্ত প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া জিনিষপত্র লইয়া দিল্লীর সমস্ত দর্শনযোগ্য স্থান দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। হোটেলের ম্যানেজার পথপ্রদর্শকরূপে আমাদের সঙ্গে চলিল। আমরা প্রথমে যুধিষ্ঠির যেখানে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই ইন্দ্রপ্রস্থে যাইলাম। সেখানে আর্য্যকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ চিহ্নমাত্র স্থানে স্থানে রহিয়াছে বাদশা সেইখানে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। রাজসূয় যজ্ঞের হোমকুণ্ড এখন একটি প্রাচীর বেষ্টিত মঞ্চ। হুমায়ূন বাদসা সেই মঞ্চ দেখিবার উদ্দেশে উচ্চ প্রাচীরে উঠিতে গিয়া পড়িয়া মারা যান। এক্ষণে হুমায়ূন টুম্ব নামে খ্যাত স্বীয় সমাধি-

ভবন প্রস্তুত করাইতে ছিলেন। বেগম স্বামীর মৃত দেহ সেইখানে সমাধিস্থ করেন ও সমাধিভবন সম্পূর্ণ করাইয়া দেন। আমরা ইন্দ্রপ্রস্থ দেখিয়া হুমায়ুন টুম্ব দেখিতে যাইলাম। হুমায়ুন টুম্বে যাইয়া তত্রস্থ বাদসার ও তাঁহার পরিবারের সকলের সমাধি-ভবন দেখিলাম। সেই বাড়ীর কারুকার্য্য দেখিয়া শিল্পকল্পনার ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি হয়। আর সমাধি দেখিয়া ঐশ্বর্য্যের নশ্বরত্বও মনে পড়ে। মুসলমানের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরানের বচন বাড়ীময় খোদিত রহিয়াছে। সেখানে বাদ-সার গুরু ফকিরেরও সমাধি। ফকিরের সেই ঘরটিতে চন্দনকাষ্ঠের ছাদ হইতে সূত্র সংযোগে কতগুলি বৃহৎ পক্ষী বিশেষের ডিমের খোলা চারদিকে টাঙ্গান আছে সেরূপ পক্ষীর ডিম সচরাচর দেখা যায় না। খোলাটি আস্ত রাখিয়া তাহা শাঁস বাহির করিয়া ফুল দিয়া সাজাইয়া একজন মোল্লা

বসিয়া পূজা করিতেছে। বাদসার মেয়ে জাহা-নারা পৃথ্বিরাজকে ভালবাসিয়াছিল কিন্তু পৃথ্বিরাজ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করায় সেই প্রেমিকা এই সমাধিস্থ ফকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া মনের দুঃখে দেওয়ানা হইয়া জীব-নের অবশিষ্ট দিন নিরবে প্রতিদান-আশা-শূন্য প্রেমের ধ্যান করিয়া অন্তিমে চির প্রেমময়ের কাছে চলিয়া গিয়াছে, তাহার ও দেহ এইখানে সমাধিস্থ আছে।

ওখান হইতে পৃথ্বিরাজের দুর্গ এবং হস্তিনাপুরীতে পৃথ্বিরাজের প্রতিষ্ঠিত যোগ-মায়ার মন্দির দেখিয়া মথুরায় রওনা হইলাম। মথুরায় পৌঁছিয়া যমুনার ধারে একজন পাণ্ডার বাড়ীতে উঠিয়া পরে মথুরার দর্শনযোগ্য স্থান সকল দেখিতে বাহির হইলাম। মথুরায় দর্শন যোগ্য বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই, তবে কৃষ্ণের কংশ বধের বৃত্তান্ত সকল যে ভাবে গড়িয়া রাখিয়াছে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

কৃষ্ণ কংশকে কেশাকর্ষণ করিয়া মারিতেছেন, কংসের কারাগার, কৃষ্ণের সূতিকাগার, প্রভৃতি নানা দৃশ্য এইরূপে স্থিরস্থায়ী হইয়া আছে। যমুনায় কংশবধ করিয়া যেখানে কৃষ্ণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন সেই ঘাটের নাম বিশ্রাম ঘাট। এখানকার পাণ্ডারা বড় অসৎ-লোক, আমাদের বৃন্দাবন যাইবার কথা শুনিয়া "ব্রজবাসা গলার ফাঁসি" ইত্যাদি বচন আওড়াইয়া ভয় দেখাইল ও নিজে চারি টাকায় মথুরা ও বৃন্দাবন দেখাইবার ফুরণ করিয়া লইল; পরে বৃন্দাবনে যাইয়া আমাদের নূতন লোক দেখিয়া দুই একটি স্থান মাত্র দেখাইয়া ফিরাইয়া আনিতেছিল, তখন একজন ব্রজবাসী আসিয়া মথুরার পাণ্ডার হস্ত হইতে রক্ষা করিল। সে সঙ্গে থাকিয়া বৃন্দাবনের সমস্ত দ্রষ্টব্য দেখাইয়াছিল, তাহার নাম বড় মজার—ছোট-মোট-সাড়ে-তিন-ভাই। বৃন্দাবনে যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহার মধ্যে শেঠেদের ঠাকুরবাড়ী এবং গোবিন্দজির

মন্দির উল্লেখযোগ্য। শেঠেদের ঠাকুরবাড়ীতে স্থবর্ণের তালবৃক্ষ আছে এবং পূজার বাসন সব স্বর্ণনির্ম্মিত। মন্দিরের ভূমিতে শেঠের মূর্ত্তি অঙ্কিত, দুই হাত জোড় করিয়া আছে; সেখানকার পুরোহিত তাহার ভাবার্থ বলিল যে, গোবিন্দের নিকট হাতজোড় করিয়া জানাইতেছে—প্রভু আমার কি সাধ্য, এই সকলই তোমার ইচ্ছা। তাহার পার্শ্বদেশে উক্ত শেঠের অন্ধ ম্যানেজারের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে এই ম্যানেজারের অন্ধ হইবার কারণ উক্ত মন্দির যখন শেঠ নির্ম্মাণ করে তখন ম্যানেজার বলে যে, ইহা শ্বেত পাথরের নির্ম্মাণ করিতে হইলে অত্যন্ত ব্যয় পড়িবে, লাল পাথরের করিলে কমে হইবে। কালীয়দমন কুঞ্জবন প্রভৃতি দেখিয়া আমরা একেবারে আগরা রওনা হইলাম; আমাদের পথপ্রদর্শক ব্রজ-বাসিকে চলিয়া আসিবার সময় কিছু পুরস্কার দিয়া আসিলাম।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় আগ্রায় আসিয়া পৌঁছিলাম আগ্রাতে পৌঁছিয়াই ষ্টেসন হইতে গাড়ী করিয়া হোটেলের অনুসন্ধানে যাত্রা করিলাম এবং একটা ধর্ম্মসভার কাছে একটি হোটেল পাওয়া গেল। সে হোটেলটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দোতলা বাড়ী আসবাব সব দিল্লির হোটেলের মতনই আছে তবে বেশির মধ্যে একটি টেবিল। এই হোটেলটিও ব্রাহ্মণের। আমরা সেখানে পৌঁছিবামাত্র দুই জন চাকর আসিয়া আমাদের কি কি আবশ্যক জিজ্ঞাসা করিয়া তৎক্ষণাৎ মুখ হাত ধুইবার গরম জল ও চা আনিয়া দিল এবং ১৫ মিনিট পরে গরম গরম আহার্য্য আনিয়া উপস্থিত করিল। এখানকার ঘরভাড়া ॥০ আনা রোজ। আবার দিল্লিরই মত একজন প্রদর্শক আসিয়া আমাদের বলিল—আগ্রার কেল্লা ইত্যাদি সব দেখিবেন ত? তাহা হইলে আমাকে কিছু অগ্রিম দিন, কেল্লা দেখিবার পাস আনিতে

॥/০ আনা খরচ হইবে। আমরা ৶০ আনা পয়সা তাহাকে বায়নাস্বরূপ অগ্রিম দিলাম, সে বলিয়া গেল—আমি পাস লইয়া রাখিব আপনারা যথা সময়ে দেখিতে পাইবেন। তখন রাত্রি হইয়াছিল আমরাও শ্রান্ত ছিলাম স্নুতরাং নিদ্রার নিমিত্ত শয়ন করিলাম। পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে আমরা উঠিয়া প্রাতঃ-কৃত্য সমাধা করিবার পূর্ব্বেই হোটেলের দরজার কাছে বস্ত্র, পাথরের জিনিষ, নানাবিধ কাঠের জিনিষ আনিয়া ফেরীওয়ালাগণ বিক্রয় করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার সাধ্যসাধনা আরম্ভ করিল, কাজেই সকলের নিকট কিছু কিছু ক্রয় করি-লাম। পরে গাড়ী আনিয়া আমরা তাজমহলাদি দেখিতে বাহির হইলাম। তাজমহলের বিশেষ বর্ণনা করা এখানে নিস্প্রয়োজন কারণ তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। দেখিলাম তাজমহলের একটি গেট গর্ভমেণ্ট মেরামত করিয়া দিয়াছেন তাহার খরচ শুনিলাম সোত্তর হাজার টাকা;

আর ভিতরের ভিত্তিগাত্রে প্রায় একহাত জায়গা মেরামত করিয়াছেন তাহারও ব্যয় পড়িয়াছে শুনিলাম দশ হাজার টাকা। কবর আদি আর যাহা দর্শনযোগ্য ছিল তাহা দেখিয়া কেল্লার নিকট আসিয়া শুনিলাম আমাদের প্রদর্শক তখনও আসে নাই। হোটেলটি কেল্লার নিকটে কাজেই আমরা হোটেলেই ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের হোটেলওয়ালার একখানি টাঙ্গা গাড়ী আছে আমরা সেই গাড়ীতেই সমস্ত দেখিতে বাহির হইয়াছিলাম। আমরা হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর সেই প্রদর্শক আমাদের সংবাদ দিল তখন আমরা হোটেলওয়ালার সেই টাঙ্গাখানি আনাইয়া কেল্লা দেখিতে চলিলাম। কেল্লার দ্বারে গিয়া দেখি আমাদের প্রদর্শক পাস লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গেটে একজন গোরা পাহারা আছে সে পাস খানি লইয়া আমাদের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিল।

আমরা ভিতরে যাইয়া আগে গেটকয়টি দেখি-
লাম—প্রথম অমরসিংহ রাজ্য জয় করিয়া একটি
প্রকাণ্ড হস্তি আনিয়া সেই গেটে বসিয়াছিলেন
তাই তাহার নাম Elephant বা হাতি-গেট
এই গেটের দুই পার্শ্বে অমরসিংহের বাস
ভবন এবং অমরসিংহের প্রবেশসূচক যে নহবৎ
বাজিত দুইধারে তাহার দুইটি ঘর রহিয়াছে,
অপর একটি গেট দিয়া যমুনার জল কেল্লার
ভিতর আসিত, যোধবাই সেই জলে স্নান
করিতেন, সেই গেটের নাম Water বা
জলের গেট ; গভর্ণমেণ্ট সেই গেট বন্ধ
করিয়া দিয়াছেন। আর একটি গেটের নিম্ন
দিয়া বরাবর যমুনা পর্য্যন্ত একটি সুরঙ্গ পথ
রহিয়াছে, প্রতি অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায়
যোধবাই সেই পথে যমুনায় স্নান করিতে
যাইতেন, তাহাও গভর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া
দিয়াছেন। জাহাঙ্গীর বাদসার তিন স্ত্রী ছিল
মারিয়ম খৃষ্টান, যোধবাই হিন্দু, আর বানু

বেগম মুসলমান। যোধবাই এই যবন গৃহে যবন পতির সহধর্ম্মিনী হইয়াও আপনার হিন্দু-ধর্ম্মের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন। কেল্লার ভিতর একটি গোবিন্দজীর মন্দির ছিল, আরঙ্গ-জেব বাদসা হইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। আমরা নীচে দেখিয়া উপরে যাইবার সময় বাগানে দেখি একটি প্রকাণ্ড বাটি রহিয়াছে তাহার দুইধারে দুইটি সিঁড়ী, তাহাতে বাদসা স্নান করিতেন, তাহার নাম Bathing cup অর্থাৎ স্নানের বাটি। উপরে উঠিয়া তিনটি বেগমের তিনটি পৃথক মহল দেখিলাম। যোধবাই বেগমের মহলে ভিত্তি গাত্রে বিবিধ অলঙ্কার ও টাকা কড়ি প্রভৃতি রাখিবার নিভৃত স্থান খোদিত আছে। এই মহলের একস্থানে একটি প্রকাণ্ড বারান্দা রহিয়াছে সেখানে বাদসা বেগম বসিয়া মৎস্য ধরিতেন, পয়ঃপ্রণালী দিয়া যমুনার জল ভিতরে আসিত। যেখানে নওরো-জার দিনে বাজার বসিত সেই স্থানটাও

দেখিলাম আর একস্থানে পুরুষদের জন্য ঐরূপ বাজার বসিত তাহাও দেখিলাম। বাদসার ভজনালয় অর্থাৎ মসজিদ দেখিলাম তাহা এত বড় যে তাহাতে পাচ সাত শত লোক একত্রে ভজনা করিতেন। অন্দর মহল হইতে একটি পথ আছে সেই পথ দিয়া প্রতি শুক্রবার বেগমেরা মসজিদে আসিতেন। অন্দর মহলেও বেগমদের জন্য একটি স্বতন্ত্র মসজিদ আছে। বেগমদের লুকোচুরি খেলিবার আর একটি প্রকাণ্ড বাড়ী আছে, চারিদিকে লুকান পথ আছে। একটি পাসা খেলিবার বাড়ী আছে তাহার মেজেতে পাসার ছক অঙ্কিত; ষোলটি সুন্দরী বালিকাকে চার বর্ণের কাপড় পরাইয়া ঘুটি সাজান হইত, বেগম পাসা ফেলিয়া চাল বলিতেন আর এই সজীব ঘুঁটি ছকের নির্দ্দিষ্ট ঘরে যাইয়া বসিত। বেগমদের স্নানাগার দেখিলাম; গোলাপ জল, ঠাণ্ডা জল, গরম জল প্রভৃতির ফোয়ারা শুষ্ক হইয়া রহি-

য়াছে। একস্থানে এক জোড়া বৃহৎ চন্দন কাষ্ঠের দরজা দেখিলাম তাহা কোন হিন্দু রাজাকে জয় করিয়া আনিয়া রাখা হইয়াছিল। বাঁদিদের কারাগার রহিয়াছে বাঁদিরা দোষ করিলে সেই কারাগৃহে বন্দী হইত। কেল্লাটি আগাগোড়া প্রস্তর নির্ম্মিত সেই মণিমাণিক্য খচিত ময়ূরসিংহাসনের পরিবর্ত্তে একটি কৃত্রিম প্রস্তর নির্ম্মিত সিংহাসন রহিয়াছে তাহাও স্থানে স্থানে মাতাল গোরারা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে লোহার পতক মারিয়া সংস্কার করিয়া রাখা হইয়াছে। ছাতের উপরে বাদসার প্রকাণ্ড কষ্টিপাথরের সিংহাসন এই সিংহাসনে মিউ-টিনির সময় একটি গোলা আসিয়া লাগিয়াছিল তাহার দাগ দেখা যায়। সিংহাসনের এক স্থানে একটি লম্বা ফাট আছে তৎসম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, গোরা জুতাশুদ্ধ পা রাখিয়াছিল তাই ফাটিয়া রক্তধারা নির্গত হইয়াছিল। যেখানে জাহাঙ্গীর বন্দী হইয়াছিলেন সেই বন্দিশালাও দেখিলাম।

আগ্রা দেখা হইলে আমার ভ্রমণ শেষ করিয়া ষোড়শ দিবসের দিন বাটি আসিয়া পৌঁছিলাম।

গৃহিনীপনা।

আমাকে বাল্যকালে গৃহিনীপনা শিখাইবার মা ব্যতিত আর কেহ ছিল না। আমি দেখিলাম সংসার করিতে হইলে প্রথমে ধৈর্য্য পরে শৃঙ্খলা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আয়ত্ব করা চাই। শিশুপালন বিদ্যা ও প্রধান। তাহার আনুষঙ্গিক মুষ্টিযোগ ও জানা চাই।

সুশৃঙ্খলা অর্থে সাংসারিক দ্রব্যাদি যথাস্থানে সুবিন্যস্ত ভাবে রাখা ও সমস্ত কাজকর্ম্মে নিজের জীবনকে নিয়মিত ভাবে পরিচালনা করা অর্থাৎ রন্ধনগৃহে পাঠ্যপুস্তক, ভাণ্ডারগৃহে কেশবিন্যাসের দড়ি বা শয়নগৃহে চালের হাঁড়ি এইরূপ উল্টাপাল্টা না হয়। সুব্যবস্থার উদাহরণ স্বরূপ দেখ যে যদি ভাণ্ডার-গৃহে যে সমস্ত দ্রব্যাদি রক্ষিত প্রত্যেকের নাম ছোট কাগজে লিখিয়া পাত্রের গাত্রে আঁটিয়া রাখিলে এই সুবিধা যে, যে প্রত্যহ ভাণ্ডার হইতে দ্রব্যাদি বাহির

করিয়া দেয় সে যদি কোন কারণে একদিন না পারে তাহা হইলে অপর কেহ ভাঁড়ার দিতে গিয়া কিসে কি আছে বলিয়া হাঁতড়াইতে হয় না।

আজকাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার যে রকম চলন তাহাতে প্রায়ই সকল গৃহস্থের গৃহে অন্ততঃ দু-চারটি শিশি ঔষধ আছেই। কাহারও জ্বর হইলে প্রথমে একোনাইট ৬ ক্রম পরিষ্কার জলে এক ফোঁটা খাওয়াইয়া দিলে অনেক সময়ে জ্বর আর বাঁকা দিকে যাইতে পারে না। আর তাহা যদি ঘরে না থাকে তাহা হইলে আদা চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া একটি কাঠিতে তাহা গাঁথিয়া প্রদীপের শিখায় দগ্ধ করিয়া লইয়া মিছরিসহযোগে খাইতে দিলে একোনাইটেরই কার্য্য করিবে, অর্থাৎ জ্বরকে বাঁকা দিকে যাইতে দিবে না। ছোট ছেলের জ্বর ও কাশি থাকিলে সিকি তোলা কালতুলসিপাতার রস কিঞ্চিৎ মধু ও

পাঁচ সাত ফোঁটা পানের রস পিত্তলপাত্রে গরম করিয়া তাহা সামান্য গরম থাকিতে থাকিতে তাহা ঐ পরিমাণে সকাল সন্ধ্যা দুইবার খাওয়াইয়া দিবে।

খাঁটি সরিষার তৈলে একটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া এমন ভাবে সলিতা দিবে যাহাতে প্রদীপ জ্বলিবার কালে সলিতা বহিয়া ফোঁটা ফোঁটা জ্বলন্ত তৈল নিম্নে পড়ে; সেই তৈলের ফোঁটা একটা পাত্রে ধরিবে। এইরূপে ধরা তৈলকে দীপ-তেল বলে। এই তেল ছেলেদের ঘুংরি বালসা কাশিতে মালিশ করিলে এমন কি ঘায়ে লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়। জ্বরের সঙ্গে যদি ছোট ছেলেদের হাঁপানী কাশি থাকে তবে একটি লৌহের পলায় খাঁটি সরিষার তৈল রাখিয়া প্রদীপের উপরে ধরিয়া গরম করিবে; তৈল গরম হইলে তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণের গুঁড়া নিক্ষেপ করিবে; যখন ফেণা উঠিবে তখন সেই তেল বুকে হাতের

পায়ের তেলোয় মাথায় ব্রহ্মরন্ধ্রে দিলে হাঁপানি সারে।

রক্ত আমাশায় জানি হরিতকী পাঁচ সাতটি নূতন সরায় গব্যঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইয়া দুই তিন বার খাইতে দিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

কাশির পাঁচন—জ্যেষ্ঠমধু গোলমরিচ লবঙ্গ কাল তুলসীমঞ্জরী শুঁট ও মিছরি প্রত্যেক দ্রব্য আধ তোলা হিসাবে মিশ্রিত করিয়া আর যদি দাস্ত পরিষ্কার না থাকে তাহা হইলে জানি হরিতকী ও কিসমিস দুইটিই অর্দ্ধতোলা হিসাবে সংযোগ করিয়া একটি হাঁড়িতে অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে; এই পাঁচন দুই তিন বার খাইতে দিলে আশাতীত ফল পাওয়া যাইবে।

ক্ষত ফোড়া পাকাইবার ও শুকাইবার ঘি—অর্দ্ধসের মহিষের ঘৃতে গ্যাঁদা পাতা ১ তোলা, রশুন ১ তোলা, নিমপাতা ১ তোলা,

এই কয়টি দ্রব্য ভাজিয়া ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিবে সেই অবশিষ্ট ঘৃত ক্ষত স্থানে ও ফোড়ায় লাগাইলে আরোগ্য হয়।

রন্ধনবিদ্যায় পারদর্শী হওয়া গৃহিনীপনার আর একটি লক্ষণ কিন্তু সে বিষয়ে বিপ্রদাস বাবু ও প্রজ্ঞাসুন্দরীর পুস্তকের কাছে আমার রন্ধন বিষয়ে উপদেশ দিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। তবে যা দু-একটি দিলাম তাহা আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার ফল।

চাট্‌নি—বাঁধা কপি সরু সরু করিয়া কাটিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া পাত্রে রাখ, পরে কড়ায় তেল চড়াইয়া ঐ সিদ্ধ কপিকে ভাজিয়া পৃথক রাখ, পরে একটি পাত্রে পরিমাণ মত তেঁতুল চিনি কিম্বা গুড় গুলিয়া রাখিয়া তাহাতে সামান্য হলুদবাটা দেও, পরে আবার কড়ায় তেল চড়াইয়া তেল পাকা হইলে মেতি ও সরিষা ফোঁড়ন দেও, তেঁতুলগোলাটি ঢালিয়া ভাজা কপিগুলি তাহাতে ছাড়িয়া দিয়া সামান্য

দুটি ময়দা দিয়া ঘন ঘন হইলে নামাইয়া লও। ভাত লুচি উভয়ের সঙ্গে ইহা চলিবে।

নারিকেলের মালপোয়া—একসের ময়দা নারিকেল জলে কিম্বা দুধে গুলিয়া তাহাতে আধপোয়া চিনি মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ ঝুনা নারিকেল কোরা দিয়া কিঞ্চিৎ ছোট এলাচের গুঁড়া তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে; একসের চিনির রস করিয়া একটি পৃথক পাত্রে রাখিবে; কড়ায় অর্দ্ধসের ঘৃত চড়াইয়া ঐ ময়দা গোলা গোল গোল করিয়া ভাজিয়া পূর্ব্বপাত্রস্থিত রসে নিক্ষেপ করিবে; অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তাহা আহারের উপযোগী হইবে।

আমি এইখানে আমার গৃহিনীপনা মধুরেণ সমাপন করিলাম।

ফুল ।

ফুল ! আমি তোমায় বড় ভালবাসি, এত সৌন্দর্য্য আর কিছুতেই দেখিতে পাই না। ঈশ্বর তোমাকে কোমলতা ও পবিত্রতার আধার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ? আমার হৃদয় মনের কান্তি আমি তোমাতেই দেখিতে পাই, তাই তোমার দিকে আমি অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকি ; তোমার রূপে আমায় মোহিত করিয়াছে। আমার আরাধ্য দেবতার কণা মাত্র রূপ তোমাতে আছে কি না সন্দেহ, এতেই তুমি এত সুন্দর, না জানি তোমার সৃষ্টি কর্ত্তার কত রূপ ! ফুল তুমি কেমন নীরবে ফুটিয়া বিশ্ব স্রষ্টার কাজ করিয়া যাইতেছ আমার বৃথা আড়ম্বর পূর্ণ জীবনকে তোমার মত ফুটাইয়া তাঁহার কার্য্য করিয়া মরিতে ইচ্ছা করিতেছি। ফুল ! তুমি আমায় শিখাও কি করিলে তোমার মত জীবন পাইব। তোমাকে আমি বালিকা

কাল হইতে ভালবাসি, তখন তুমি আমার সঙ্গিনী ছিলে তখন তোমায় লইয়া কত খেলাই করিয়াছি। ফুল লইয়া তরঙ্গিনী বক্ষে ফেলিয়া দিতাম ঢেউয়ে যখন ফুলটিকে নাচাইতে নাচাইতে লইয়া যাইত তখন মনে এই প্রশ্ন হইত যে, ইহারা কাহার উদ্দেশে কোথায় যাইতেছে; এখনও সেই প্রশ্ন ধ্বনিত হইতেছে অনল, অনিল, গিরি, নদী, বন বক্ষে লইয়া কাহার উদ্দেশে পৃথিবী ধাবিত হইতেছে। আমাদের আত্মা প্রেম ভক্তি উপহার লইয়া কাহার চরণ উদ্দেশে যাইতেছে? ফুল! তুমি কি বলে দিতে পার যে ইহারা কাহার উদ্দেশে কোথায় যাইতেছে, তুমি ছেলেবেলায় আমার সঙ্গিনী ছিলে এখন আমার জীবন সঙ্গিনী হইয়াছ আমাকে তোমার মত হইতে শিখাও। ফুল! তুমি আমায় বলে দিতে পার আমার হৃদয়েশ্বর কোথায় লুকাইয়াছেন? যখন দেখি প্রভাতের সূর্য্য অরুণ রাগে রঞ্জিত হইয়া

পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়াছে অমনি ছুটিয়া যাই ও মনে করি বুঝি আমার হৃদয়রাজকে চুরি করিয়া রাখিয়াছে তাই এত সুন্দর দেখাইতেছে। সূর্য্য আমার দিকে চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিতেছে—

নতত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ
তমেব ভান্তমনুভাতি সব্বং
তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি

এমনি করিয়া যাহার কাছে যাই সেই আমায় বলে—কাহার সাধ্য তাঁহাকে দেখা, তিনি আমাদের সকলের মূলে থাকিয়া আমাদিগকে প্রকাশ করিতেছেন। ফুল! তুমি আমায় বলে দেও আমার জীবন সর্ব্বস্ব কোথায় আছেন। কৈ, তুমি আমায় কিছু না বলিয়া কেবল হাসিতেছ; হাস, আমি পাগলিনী আমার হৃদয়-মণি আমায় পাগল করিয়া কোথায় লুকইয়া আছেন' তাই খুঁজিতে আসিয়াছি; দেখি

তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি কি না, চিরজীবন খুঁজিয়া দেখি মৃত্যুকালে দেখা পাই কিনা।

পূর্ণিমার ইন্দু।

পূর্ণিমার ইন্দু সকলেরই আনন্দপ্রদ। প্রেমিকের, ভক্তের, কবির সকলের হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করে। শশাঙ্ককে দেখিলে কবির হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইয়া কল্পনার উৎস খুলিয়া যায়, ভাবের প্রস্রবন ছুটিতে থাকে। দম্পতির হৃদয়ের রুদ্ধ ভালবাসা উভয়ের হৃদয়ে নীরবে কার্য্য করিতে থাকে; পূর্ণিমার ইন্দুকে দেখিয়া প্রণয়ীর পবিত্র প্রণয় একের হৃদয় হইতে অপরের হৃদয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে মিশিতে চায়। তাহাতে এক উচ্ছাসময় ভাবে উভয়ে মোহিত হইয়া ওঠে। তখন তাহারা স্বপ্নরাজ্য রচনা করিয়া তাহাতে বাস করে এবং মুহূর্ত্তের জন্য পবিত্র স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকে। ভক্তের হৃদয় চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নায় পুলকিত হইয়া ওঠে তখন তাহার হৃদয় সৌন্দর্য্যের খনি হৃদয়মণি ঈশ্বরকে দেখি-বার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে। তখন সে

বাহ্যদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তখন সে হিরণ্ময়ে পরে কোষে নিষ্কলঙ্ক প্রেমচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হয়। (১)

কিন্তু ইন্দু বিরহী হৃদয়ে বিচ্ছেদ জনিত দুঃখ দ্বিগুণিত করিয়া তোলে। পূর্ণিমার চন্দ্রকে দেখিলে প্রিয়জনের প্রেমপূর্ণ আনন বিরহীর হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, তখন তাহার মন ব্যাকুল হইয়া পড়ে তড়িতের মত ভাব হৃদয় হইতে বাহির হইবার জন্য আঘাৎ করিতে থাকে, প্রিয়জন কাছে নাই একাকী আনন্দ ভোগ দুখভোগের কারণ হইয়া উঠে—তখন তাহার হৃদয় হইতে এই বাক্য বাহির হয় ঃ—

আমারি মত হৃদয় ব্যথা তার কিগো হয়
কাছে নাহি প্রিয়জন সুধাইব যায়—

মনুষ্যের স্বভাবতঃ এমন একটি গুণ আছে সে

(১) এইরূপ প্রবাদ আছে যে একজন সুবিখ্যাত দার্শনিক নাস্তিক পূর্ণিমার চন্দ্র দেখিয়া তাঁহার শেষ জীবনে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।

ভালবাসার পাত্রকে ছাড়িয়া একাকী কোন আনন্দ ভোগ করিতে চায় না, এইজন্য চন্দ্রমা বিরহীর বিচ্ছেদ ব্যথা আরও জাগাইয়া দেয়। চন্দ্র তাহার ধার করা রূপে এত লোককে মুগ্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু যে হৃদয়ে নিষ্কলঙ্ক প্রেম-চন্দ্র দেখিয়াছে তাহাকে আর বাহিরের চন্দ্র মুগ্ধ বা ব্যথিত করিতে পারে না।

ধ্রুবতারা।

তারা! তুমি অনিমেষ লোচনে চাহিয়া আছ কার দিকে? কত অসংখ্য নিশা কালের গর্ভে গিয়াছে ও যাইবে, কে তাহার ইয়ত্বা করিতে পারে? কত জীব আসিতেছে ও যাইতেছে তাহারও নির্ণয় করা যায় না। পৃথিবীর সকল ঘটনা তুমি দেখিয়াছ ও দেখিতেছ, এখনও প্রতি নিশায় ফুটিয়া মৃদু স্নিগ্ধ আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিবাসমাগমে ঊষার অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া কাহার সাধনায় মগ্ন থাক? তুমি কি আমার আরাধ্য দেবতা হৃদয়েশকে দেখিতে পাও? আমি বুঝিয়াছি, তুমি আমার সর্ব্বস্ব আমার জীবন মরণের সম্বল দরিদ্রের রত্নকে দেখ, আমার তাঁকে যে দেখিয়াছে তার কি আর চোখ পালটিবার শক্তি আছে? তাই তুমি স্থির নিশ্চল অনিমেষ লোচনে তাহারি দিকে চাহিয়া আছ। তারা! আমি জলে স্থলে ফুলে ফলে আমার প্রিয়তমের

হাতের কার্য্য, তাঁহার সৌন্দর্য্যের আভাস পাইয়া চারিদিকে ছুটিতেছি, কোথাও তাঁর দর্শন মিলিতেছে না ; তাঁহাকে যে দেখিয়াছে সেই আত্মহারা হইয়াছে তাহার কি আর নড়িবার শক্তি আছে সে স্থির ভাবে সেই করুণাময় পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে তার কি আর সংসারের দিকে লক্ষ্য থাকে, সে তোমারি মত স্রষ্টার মুখের দিকে তাকাইয়া ঈশ্বরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধান করিয়া. শেষে ঈশ্বরের চরণে আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে। তিনি আত্মাতে পরমাত্মা রূপে, পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন। তারা ! তুমি যখন মেঘের আবরণে—আচ্ছাদিত হও তখন তোমার স্নিগ্ধ জ্যোতি আর দেখা যায় না। মেঘ কাটিয়া যাইলে আবার তোমার অমল ধবল রূপ প্রকাশ পায়। মেঘ তোমায় কিছুই করিতে পারে না। তুমি যাহা তাহাই থাক, মেঘ কেবল আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন

করিয়া থাকে মাত্র। আমার এ হৃদয় মোহ মেঘে আচ্ছন্ন করিয়াছে আমি আর আমার হৃদয় রাজকে দেখিতে পাইতেছি না। আমার এ মোহ মেঘ কবে কাটিবে দয়াময়ের কৃপা পবন কবে প্রবাহিত হইবে, সেই আশাকেই সম্বল করিয়া যেন দয়াময়ের নাম করিতে করিতে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারি।

গীত।

বিভাস—দাদ্‌রা।

আমি আপনা হারায়ে
তোমাতে মজিয়ে থাকিতে চাই
তব মধুবাণী দিবানিশি শুনি
তব পথ পানে চলিতে যাই,
পঙ্গুর বাসনা পর্ব্বত লঙ্ঘনে
মিটিবে কি সাধ ভাবিসদাই।

২

আশাবরী—একতালা।

দয়াময় নাম ভাবরে রটরে মন রসনা
অনায়াসে এড়াইবে এ ভব যন্ত্রণা
মিছে সংসারে মজে ভোগ এ লাঞ্ছনা
প্রাণ মন করি তাঁরে সমর্পণ
তাঁর কাজ করি চল না।

৩

ইমন কল্যাণ—তেতালা।

হে অন্তরযামী
আমার অন্তর ব্যথা
অন্তরে রাখিব আমি
আমার এ হৃদয়ে নাথ
রাজা হয়ে বস তুমি।
তোমার এ দীন প্রজা
তোমারে করিবে পূজা
ভক্তি প্রীতি অশ্রুধারা
ইহা ছাড়া আর কিছু
কোথা বল পাব আমি।

৪

ইমন—তেওরা।

উষার আলোক ভূতল পরশি
বাঁধা হয়ে যায় প্রেমের পাশে.

দিনে দিনমণি নিশীথে চন্দ্রমা
হয়ে থাকো মোর হৃদয়াকাশে
মম আঁখিতারা দুটি, নীরবেতে ফুটি,
চেয়ে থাকে যেন তোমারি পানে,
দিবসে আমার হৃদয়পদ্ম
ফুটে উঠে যেন তোমারি আশে।

৫

বাউলের সুর।

দোকানি দোকান তোল
ঘরে যাবার সময় হল
ভবে এসে যে ঘরেতে বাস
ভেঙ্গে গেছে সে বাস।
ওরে আসা যাওয়া সার হল।
ভবের হাটে বেচতে এসে
মূলে হাবাত হয়ে গেল
এখন নাম সম্বল করে ঘরে ফিরে চল।
এই দুনিয়া ফক্কিকারি
হায়রে মোরা নগদা মুটে

শুধু পঞ্চভূতের বেগার খেটে
মরতে হল।
এখন দিন থাকতে ঘরে চল
ঐ যে আঁধার হয়ে এল।

৬ *

সাহানা—ঝাঁপতাল।

যে ফুল ফুটিয়াছিল নিরজন বনে
কেন তারে তুলে আন নিঠুর জনে।
যদি নাহি বাস ভাল,
তবে কেন পায়ে দল,
দয়া করে রেখে দিও গৃহের কোণে
স্বভাবে শুকাতে দিও আপন মনে।

৭ *

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

হরি করি কি এখন ?
না মিলিল ভালবাসা

---

* বহুদিন পূর্ব্বে লাবণ্য নামে একটি গল্প লিখিয়াছিলাম কিন্তু অযত্নে তাহা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে সেই উপন্যাসে আমার এই ষ্টার চিহ্নিত গান কয়েটি ছিল এই খানে উদ্ধৃত করিলাম।

না মিটিল কোন আশা
হৃদয় হয়েছে পুড়ে
মরুর মতন।
হরি তুমি দয়াময়,
এ বিধান কেন হয়,
একজন সুখে রয়
অন্যে কেন তারি তরে
করয়ে রোদন?
বহিতে পারি না আর
এ ছার জীবন ভার
বল নাথ তুমি বল
এ ছার জীবনে মম
কিবা প্রয়োজন?

৮

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

দাও হে চরণ তরি
এ ভবসাগরে তরি
চলে যাই ভব পারাবার পারে।
পড়িয়ে সাগর মাঝে
করি হাহাকার,
কোথা ওহে দীনবন্ধু
কর হে উদ্ধার।

৯

পিলু বারোঁয়া—পোস্তা।

রস বৈ তুমি পিতা
রসে পরিপূর্ণ ধরা।
সে রস করিলে পান
ক্ষুধা তৃষ্ণা অবসান
শান্তিময় হয় ধরা।

১০

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

আশ্চর্য্য তোমারি কার্য্য,
বুঝা নাহি যায়,
কখন কর বা সৃষ্টি
কখন প্রলয় ॥
কারে বা পাঠাও ভবে;
কারে বা ডাকিয়া লও;
বিচিত্র তোমার লীলা
তুমি লীলাময়।
দেহ শক্তি বুঝিবার,
তব প্রেম করুণার
নহিলে সে দহে মন;
শোকে অনিবার ॥

১১

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

হরিহে ভরসা তোমার কে করে,
যে তোমায় ডাকে,—
তুমি দুঃখ দেও পাকে পাকে॥
আমি মরি বাঁচি আপনি আছি,
ডাকবনা আর তোমাকে॥

১২

বেহাগ—মধ্যমান।

নূতন বরষে নাথ—
প্রণাম করি তোমায়
ভক্তি পুষ্প অশ্রুবারি
প্রেমের চন্দন করি
এনেছি হৃদয় ভরি
দিতে হরি তব পায়।
দাওহে চরণে স্থান
কর মোরে পরিত্রাণ
বিষয় বাসনা যেন
মনেতে না পায় স্থান॥

১৩

পিলু বারোয়া—ঠুংরি।

বিপদেতে ভয় করনা

আমাব মন

কর অভয় পদ দরশন

যিনি আমার হৃদয় বিহারী

তিনি বিপদের কাণ্ডারী,

আসুক না কেন বিপদ ভারি

সোজা পথে চলে যাবে

আমার এ জীবন।

১৪

খাম্বাজ—চৌতাল।

এই বিশ্বমাঝে অপরূপ সাজে

সাজিয়াছে বিশ্বরাজা

তুমি অনলে অনিল, পৃথিবী সলিল

শূন্যে রবিশশি গ্রহতারা।

তুমি পত্র পুষ্প ফলে

রূপ নিরমলে হয়েছ উজ্জ্বল

তুমি জীব রূপে সুধা ধারা।

তুমি ভ্রাতা ও ভগিনী জনক জননী
পতি পত্নীরূপে প্রেমেতে হারা।
তুমি মা হয়ে কর সন্তানে কোলে
পুত্ররূপে ধর জননীর গাল
পিতা হয়ে কর সন্তানে স্নেহ
পুত্ররূপে পুন কর জন্মগ্রহণ।

১৫

খাম্বাজ—তেওরা।

এক ব্রহ্ম সর্ব্ব ঘটে,
ভেদ বুদ্ধি কেন ঘটে ?
আমি আমি করি
মায়া ঘোরে ঘুরি,
আমিত্বের লয়
ব্রহ্মজ্ঞানোদয়
কিসে বল হয়!
চিদাকাশে ব্রহ্মজ্ঞান ভাসে
মায়ানাশে জ্ঞানোদয়।

১৬

বেহাগ—তাল ফেরতা।

তিনি পঞ্চভূত পঞ্চের অতীত
ভ্রমাতীত শুদ্ধজ্ঞান।
ঐ যে চন্দ্রমা নিশিথে বিরাজে
তমোরাশি নাশি, আলোকেতে সাজি হাসিছে,
কোথা হতে তুমি পেয়েছ জ্যোতি?
সূর্য্য হতে তব রূপের উৎপত্তি!
ঐ যে সুরয গগন মণ্ডলে
এত তেজ তুমি কোথা হতে পেলে?
মৃতপ্রায় প্রাণী নিমিষে জাগালে,
ফুটাইলে কলি হরষ লহরী
তুলে দিলে প্রাণ সাগরে,
কে মূলেতে থাকি প্রকাশিছে ভাষা?
ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে
তিনি বিশ্বপ্রাণ বিশ্ব তাঁর প্রাণ—
জীবে ব্রহ্মে একাকার।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভূমিকা	৪	ব্যক্তব্য	বক্তব্য
৵৹	৩	সহাস্ত্রী	সাহস্ত্রী
৵৹	৯	ভারবী	ভারবি
৶৹	৫	ধর্ম্ম	ধর্ম্মঃ
৶৹	৬	হিঃ	হি
৶৹	৮	প্রিয়ন্তে	প্রীয়ন্তে
৪	১৮	হইয়	হইয়া
৪২	৭	আঘাৎ	আঘাত
৪৬	৪	নিচে	নীচে
৪৬	১৮	আঘাৎ	আঘাত
৪৮	১৮	অনুষ্টানে	অনুষ্ঠানে
৫৫	৩	লুক্কাইত	লুক্কায়িত
৬১	১৭	হৃদয়পূর	হৃদয়পুর
৬২	১৪	রৌদ্রাভ্যাস্ত	রৌদ্রাভ্যস্ত
৬৬	১৪	না	০
৬৭	১৫	কুল	কূল
৬৯	১০	বঅসান	অবসান

৬৯	২	সমিরণ	সমীরণ
৭১	১০	উপসম	উপশম
৭২	৮	গলধঃকরণ	গলাধঃকরণ
৭৩	১০	নিমিলিত	নিমীলিত
৭৩	১১	রোরূদ্যমানা	রোরুদ্যমানা
৭৫	৯	শ্রবন	শ্রবণ
৭৬	৩	মূর্ত্তী	মূর্ত্তি
৮৫	৬	যায়	যায় না
৯০	৭	উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ
৯৫	৭	স্তব্ধ	স্তব্ধো
৯৫	৭	তেনে	স্তেনে
৯৫	১১	মুহূর্মুহূ	মুহুর্মুহু
৯৬	১৬	আনন্দ	আনন্দঃ
৯৭	৪	; আশ্রয়	আশ্রয়,
১০২	২	কালীমা	কালিমা
১০৮	৪	শুথতারা	শুকতারা
১০৯	৯	Cut	Cot
১১৩	৬	মন্দীর	মন্দির
১১৩	১২	ফলাকাঙ্খা	ফলাকাঙ্ক্ষা
১১৭	৭	বর্ষিয়সী	বর্ষীয়সী

১৩	লক্ষণ	লক্ষ্মণ
১০	য়াজস্থূয়	রাজসূয়
১৮	টুম্ব	টুম্
৬	নিরবে	নীরবে
৭	ময়ুর	ময়ূর
১৭	জাহাঙ্গীর	সাজাহান
২	ব্যতিত	ব্যতীত
৭	মনের	মণির
৮	সর্ব্বং	সর্ব্বম্
৯	ভাষা	ভাসা
১৫২ ১৭	লুকইয়া	লুকাইয়া
৪	গাল	গলে
৬	জন্ম	তা
৩	নিশিথে	নিশীথে

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আত্মজীবনী প্রকাশক ও আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য পণ্ডিত ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনী শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা এই পুস্তক ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পুস্তক প্রকাশের পূর্ব্বে তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নলিখিত স্থানে প্রেরণ করিলে এই পুস্তক অর্দ্ধমূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। সংসারে অনাসক্ত হইয়া কিরূপে সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহার আদর্শ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনীতে সুস্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইতি।

শ্রীপৃথ্বীনাথ শাস্ত্রী
২১ নং ষ্টেশন রোড,
বালিগঞ্জ—কলিকাতা।